

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৫৫,
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
বেঙ্গল পাবলিশার্স,
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রাকর—শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মানসী প্রেস,
৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট,
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও,
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

তিন টাকা

১

জেলের বৈচিত্র্যহীন জীবনের মধ্যে শেষের দিকের ক'টা দিন টুলুর মনের উপর গভীর রেখাপাত করিয়া গেল। উনিশ শ' বিয়াল্লিসের আগস্ট মাস, জেলের মধ্যে কেমন একটা চাপা ফিসফিসানি উঠিল—দুর্ভোগ আর বেশি দিনের নয়।··· দু-চার দিনের মধ্যেই সেটা স্পষ্টতর আকার গ্রহণ করিল। "বন্দে মাতরম্!··· ইনক্লাব জিন্দাবাদ!"···দূরে কাছে, শহরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়।···নাকি টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া দিয়াছে—সরকারী কাছারিতে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল—এইবার জেল ভাঙিয়া কয়েদীদের খালাস করিবে···আরও দূরের খবর—রেল উপড়াইয়া ফেলিয়াছে, রেলের বাঁধ কাটিয়াছে, পুল ভাঙিয়াছে···আরও দূরের—জাপানীরা নাকি ভারতীয় সৈন্যের সঙ্গে এক হইয়া ভারতীয় বিপ্লবীদের সহায়তা করিবে···কাটা কাটা খবর, কোনটার ল্যাজা বাদ, কোনটার মুড়ো; দিন পনেরো পরে সব আবার ঠাণ্ডা হইয়া গেল। কেবল কয়েদীর স্রোত দিন দিনই যাইতে 'গিল বাড়িয়া। খালি জায়গাগুলা তাঁবুতে তাঁবুতে গেল ভরিয়া।

একদিন মেটের সঙ্গে দল বাঁধিয়া ডিউটিতে যাইবার সময় কতকগুলা নূতন ধরনের কথা কানে গেল। টুলু ছিল সব শেষে, তাহার পিছনেই নূতন য়েদীদের একটা ছোট দল—অন্য জেলে নাকি বদলি হইতেছে। জন দু-তিনের ধ্যে কথা হইতেছে—

"আপনি কোথা থেকে?"

"মেদিনীপুর।"

"এতদূরে ঠেললে?"

"দূর! এ তো ঘরের কাছে মশাই; নর্থপোলে পাঠাতে পারলে তবে নিশ্চিন্দি হ'ত।"

একটু হাসি; তাহার পর—

"কেমন হ'ল?"

অপর কণ্ঠে—

"মেদিনীপুরই যখন,—সবার ওপরে যাবে।"

কথাটার গুরুত্বেই একটু স্তব্ধতা আনিয়া দিল। তাহার পর—"তা হ'লে মন্দ নয়। তবে ব্যালেন্স্ শীটে লাভের চেয়ে লোকসানই দাঁড়াল বেশি—আপাতত।"

"কি রকম?…কি রকম?…"

"পণ্ডিতমশাই—মানে, আমাদের যিনি লীডার আর কি, তাঁকে হারাতে হ'ল,—পাঁজরার নিচে একটা গুলি…তবে অবশ্য তিনটিকে ধরাশায়ী করবার পর…"

"আরম্ড্ রাইজিং ছিল আপনাদের!"

এর পরেই হঠাৎ ছাড়াছাড়ি হইল দলটার সঙ্গে, একটা লরি দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার দিকে সবাই চলিয়া গেল।

মনটা খারাপ হইয়া রহিল টুলুর, ঠিক ধাতে রাখিবার জন্য ক্রমাগতই স্তোক দিতে হইল—ও আমাদের মাস্টারমশাই নয়, নিশ্চয় নয় মাস্টারমশাই…

ঐ মাসেরই শেষের দিকে একদিন সন্ধ্যায় টুলু মুক্তি পাইয়া জেলের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্পূর্ণ একটা নূতন জগৎ, নিজেও সম্পূর্ণ একটা নূতন মানুষ, আটটি বৎসরের মধ্যে কি যে একটা নিঃশব্দ প্রলয় ঘটিয়া গেল—ওদিককার সঙ্গে এদিককার যেন কোন মিল নাই।…বাড়ি নাই, সমাজ নাই; মাস্টারমশাইও নাই। যাক, সে কিন্তু একটা বিরাট মুক্তি। জীবনের আকাশে ধূমকেতুর মতোই কোথা থেকে উদয় হইয়া সমস্ত ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া গেল লোকটা—ঘর গেল, সমাজ গেল, ধর্ম গেল।…ভালো হইয়াছে…পাঁজরার নিচে একটা গুলি…

বিদ্বেষের মধ্যেও চোখ যে কেন সজল হইয়া ওঠে!...পাঞ্জাবির খুঁট তুলিয়া টুলু উদ্গত অশ্রু মুছিল। মনটা রূঢ় বাস্তবের সামনে সজাগ হইয়া উঠিল,—অপরিচিত জগৎ, সামনে রাত্রি; মনে পড়িল, জেলটা একটা আশ্রয়ও ছিল,—অন্ন জোগাইত, মাথার উপর একটা আচ্ছাদনের ব্যবস্থা ছিল, মুক্তি এ দুইটা থেকেই বঞ্চিত করিয়াছে। পকেটে ব্যাগটা রহিয়াছে, গুনিয়া দেখিল—এগারো টাকা সওয়া নয় আনা সম্বল। আপাতত চলিবে, তাহার পর শূন্য জীবন, শূন্য পকেট...যাক, অত ভাবা যায় না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শুধু একটা কথা নিশ্চয় করিয়া লইয়াছে—বাড়ি যাইবে না। আজ ছ'মাস হইতে বাড়ির কোন খবর নাই; বাবা মা অসুস্থ ছিলেন। কী যে হইয়াছে বেশ বোঝা যায়, এ তবু একটা সন্দেহের সান্ত্বনা থাকিবে; বাড়ি গেলেই তো নগ্ন সত্য। তা ভিন্ন জীবনের এই নূতন ইতিহাস লইয়া বাড়ি গিয়া কি দাঁড়াইতে পারিবে? আর বাড়ির মাটি কলঙ্কিতই বা করা কেন? হঠাৎ মুক্তিতে এ একটা হইল ভালো। সময়ে হইলে হয়তো কেহ লইয়া যাইতে আসিয়া পড়িত।

জেলের দেয়ালের পাশে পাশে আসিয়া রাস্তাটা দুই দিকে চলিয়া গেছে,—একটা আদালতের দিকে, একটা শহরের দিকে। আদালতের কাছাকাছি হোটেল থাকা সম্ভব, টুলু তেমাথায় দাঁড়াইয়া একটু ভাবিল, তাহার পর শহরের দিকেই পা বাড়াইল, আইন-আদালতের চিন্তাও যেন বিষ হইয়া উঠিয়াছে, হয়তো জেলফেরত কাহারও সঙ্গেই দেখা হইয়া যাইবে। দেখা যাক, শহরে রাত্রিটা কাটাইবার যদি কোন ব্যবস্থা হয়—দোকানে-টোকানে; হোটেলও থাকে।

বাজারে আসিয়া পড়িল। ভদ্র কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিতে যেন আটকাইয়া যাইতেছে গলায়—আট বৎসরের সঙ্গগুণ! একটা ফলের দোকানের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। সাদা একটা প্রশ্ন কি করিয়া করিতে হয় যেন ভুলিয়া গেছে। একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—"আচ্ছা, এদিকে কোথাও থাকবার একটু ব্যবস্থা হতে পারে—একটা রাত?"

"শহরের মধ্যে গিয়ে দেখো, বাজারে আর কে দেবে?"

ভুল হইয়া গিয়াছে প্রশ্নটা, টুলু যেন একটু থতমত খাইয়া গেল।

একটি বছর আষ্টেকের ছেলে এক ঠোঙা ফল কিনিয়া রাস্তার দিকে পা বাড়াইয়াছিল, ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া এক নজরে দেখিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—"আমাদের বাড়িতে থাকবেন ?"

টুলুর কান দুইটা গরম হইয়া উঠিল, সন্তর্পণেই দৃষ্টি নামাইয়া নিজেকে একবার দেখিয়া লইল—সত্যই সবার করুণা উদ্রেক করাইবার মতো অবস্থা দাঁড়াইয়াছে নাকি ?—ও-লোকটা 'দেখুন'ও বলিল না,—'শহরের মধ্যে গিয়ে দেখো !'

উত্তর করিল—"না, আমি একটা হোটেল-ফোটেল খুঁজছি…"

ধারণাটা বদলাইয়া দিবার জন্যই দোকানীকে বলিল—"টাকা-খানেকের ফল দাও তো—এই নেবু বেদানা খেজুর মিলিয়ে…"

ছেলেটি আর একবার ফিরিয়া দেখিয়া চলিয়া গেল। বেশ ফুটফুটে ছেলেটি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, হাফপ্যাণ্ট পরা, গায়ে একটা খদ্দরের হাফশার্ট। ফল কিনিয়া টুলু পা চালাইয়া ছেলেটির পাশে আসিয়া পড়িল।

প্রশ্ন করিল—"কোথায় তোমার বাড়ি খোকা ?"

"জেলখানা জানেন ?"

প্রশ্নটা বড় অদ্ভুত ঠেকিল কানে, টুলু একটা ঢোঁক গিলিয়া উত্তর করিল—"হ্যাঁ, জানি।"

"ওরই কাছে—ওদিকটায় যে কতকগুলো বাড়ি আছে, তারই মধ্যে।"

"অনেকটা দূর, একলা এসেছ, ভয় করে না ?"

"না, ভয় করবে কেন ? মা বলেছেন—ভয় করতে নেই, দাদুও বলেন।"

পদক্ষেপে বেশ একটু সাহস জাগাইয়া দিল।

"তুমি কার ছেলে ?"

"বাবার আর মার।"

"কি করেন বাবা তোমার ?"

"কাজ করেন, অনে—ক দূরে ; এইবার আসবেন।"

"এখানে কে কে থাকেন ?"

"মা আর আমি।"

"আর কেউ নয় ?"

"আর যার কষ্ট হয়, অসুখ করে।···আপনি চলুন না, যাবেন ? মা আমায় বলেন ডেকে নিয়ে যেতে।"

টুলু একটু কি ভাবিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—"অসুখ-করা কেউ আছে বাড়িতে ?"

"কাল ছিলেন একজন, বুড়িদিদি ব'লে ডাকতুম, মা আজ সকালে হাসপাতালে দিয়ে এসেছেন, দেখতে গিছ্‌লুম এব্‌লা দুজনে। ভালো হয়ে আবার আসবেন।"

খানিকটা পথ নীরবেই কাটিল। টুলু কি ভাবিতেছে। এক সময় আবার প্রশ্ন করিল—"না, সে কথা জিগ্যেস করছি না, বেটাছেলে কেউ থাকে না বাড়িতে ?"

"আমি তো আছি।"—আবার একটু সিধা হইয়া ঘুরিয়া চাহিল, তাহার পর টুলুর মৃদু হাসিতে যেন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল—"আর দাদু ছিলেন ; গেলেন কিনা তিনি···"

"কতদিন হ'ল ?"

"অনে—ক দিন। · তা ব'লে এক বছরের মতন অনেক দিন নয়।"

"তবে ?"

"এই···এই···আমরা যখন···"

"কোথায় গেলেন ?"

"বাবার কাছে—তাঁকে নিয়ে আসতে।"

"তোমার বাবাকে দেখেছ কখনও ?"

"না, অনেক দূরে কাজ করেন যে। এইবার দেখব। খুব সুন্দর দেখতে বাবা আমার। রোজ আমরা দুজনে—মা আর আমি—ঠাকুরের ছবির সামনে ব'সে বলি—বাবাকে ভালো রেখো ঠাকুর, শীগ্‌গির শীগ্‌গির পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে।···বাবাও ঠাকুর, জানেন তো ?"

"সত্যি নাকি ?"

খুব গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—"মা বলেছেন—সবার বাবা সবার ঠাকুর। বাবাকেও প্রণাম করি আমি মনে মনে···"

"আর সবার মা ?—তিনিও তো ঠাকুর। করো প্রণাম তোমার মাকে ?"

ছেলেটি একটু বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া দেখিল, বলিল—"মা তো কখনও বলেন নি।"

"ছবির ঠাকুর তোমায় কখনও বলেছেন যে তিনি ঠাকুর ?"

"ছবির ঠাকুর তো কথা কইতে পারেন না।"

তর্কে হারিয়া টুলু হাসিয়া ফেলিল, বলিল—"তা বটে। তবে পারলেও বলতেন না, নিজেকে কেউ বড় বলে না তো, বলতে নেই। মাকেও ক'রো প্রণাম।···আর একটা কথা, তোমার মা কি—?"

বড় রাস্তা কখন্ ছাড়িয়া দিয়াছে। সামনেই একটা লম্বা পুকুর, তাহার পাশ দিয়া অল্প চওড়া একটা কাঁচা রাস্তা, ছাড়া ছাড়া বাড়ি। সামনেই একটা, ছেলেটি তাহার সিঁড়িতে উঠিয়া পড়িয়া বলিল—"আসুন না।"

টুলু একেবারে হকচকিয়া গেল। ব্যস্তভাবে বলিল—"এসে গেলে নাকি বাড়ি ?···না, না, আমি যাই···আসব বলি নি তো ; কথা বলতে বলতে এসে পড়েছি।"

ছেলেটি নামিয়া আসিয়া পাঞ্জাবির খুঁট ধরিল,—"না, চলুন, এসে তো গেছেন···"

"না, না···"

তাহার পর হঠাৎ বারান্দার মধ্যে দরজার মাথায় নজর পড়িয়া গেল ; যেন বাঁচিল, বলিল—"দরজাও তো বন্ধ—তালা দেওয়া।"

ছেলেটি একটু ধাঁধা খাইয়া গেল, সেই সুযোগেই টুলু "যাই আমি" বলিয়া ফিরিয়া পা বাড়াইল।

তিন-চার পা গিয়া আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"একটা কথা জিগ্যেস করলাম না তো,—তোমার নাম কি খোকা ?"

এমন সময় পাশের বাড়ি থেকে একটি স্ত্রীলোক একটু হন্তদন্ত হইয়াই রাস্তায় নামিয়া পড়িল, প্রশ্ন করিল--"কে রে হীরা ? কার সঙ্গে···"

টুলু আগাইয়া আসিল, আট বৎসর পর চম্পার সঙ্গে মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইল। অনেক কিছুর সঙ্গে একটা বড় পরিবর্তন—চম্পার সীমন্তে সিঁদুরের রেখা।

নিঃশব্দে দুইজনে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। সমস্ত ব্যাপারটুকুর মধ্যে যে সম্পূর্ণ একটা নূতনত্ব ছিল, সেটা হীরককেও মৌন করিয়া রাখিল।

একবার "বসুন" বলিয়া ঘরে একটা চেয়ারে বসাইয়া চম্পা নিঃশব্দে আয়োজনে লাগিয়া গেল। একটু পরে টিউবওয়েলে জল তোলার শব্দ হইল খানিকটা। তারপর একবার কাপড় তোয়ালে গেঞ্জি কলতলায় রাখিয়া আসিয়া বলিল, "এইবার মুখ হাত পা ধুয়ে নিন।" এক জোড়া চটিজুতা পায়ের সামনে রাখিয়া দিল—আট বছর আগে ছাড়া টুলুর চটি, তাহার পর গলায় অঞ্চল দিয়া প্রণাম করিয়া হতবাক হীরকের পানে চাহিয়া বলিল—"প্রণাম করো।"

হীরক প্রণাম করিয়া চম্পার কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল, একটু আড়ে চোখ তুলিয়া অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করিল—"কে ?"

ধোপদস্ত কাপড় গেঞ্জি তোয়ালের মতো চম্পার যেন সবই ঠিক করা আছে, বেশ সপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর করিল—"তোমার বাবা।"

টুলুর দৃষ্টিটা আর একবার আপনা-আপনিই সিঁথির সিঁদুরের উপর গিয়া পড়িল। চম্পা বলিল—"নিন, উঠুন।···মুখ হাত পা ধোওয়া হয়ে গেলে ব'সে ব'সে গল্প ক'রো হীরা, আমি আসছি।"

স্টোভ জ্বালার শব্দ হইল। একটু পরে চা হালুয়া, একটা রেকাবিতে কিছু ফল লইয়া উপস্থিত হইল।···চোখ দুইটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। নিশ্চয় ধোঁয়ায় নয়, স্টোভের আগুনে সে বালাই নাই ; চম্পা আনন্দ আর বেদনাকে যে কি ভাবে

চাপা দিয়া ফিরিতেছে বুঝিল টুলু, কথার অংশ রহিল কম, উচ্ছ্বসিত কিছুর ভয়েও, তা ভিন্ন হীরক রহিল বাধা হইয়া।

হীরক নিদ্রা যাওয়ার পর চম্পা টুলুর পায়ের কাছে মাদুরটাতে আসিয়া বসিল। টুলু বলিল—"সব একরকম বুঝলাম, পথে হীরার সঙ্গে কথাবার্তায়ই সন্দেহ হয়েছিল, হয়তো তুমিই এসে রয়েছ—কিন্তু একটা কথা বুঝছি না চম্পা, তোমার এক দিকে আমায় অভ্যর্থনা করবার আয়োজন, আর এক দিকে তাড়াবার।"

চম্পা মাথা নিচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল একটু, তাহার পর বলিল—"সিঁদুরের কথা বলছেন আপনি?···কি উপায় আছে বলুন এ ভিন্ন? মাস্টার-মশাইও তো দেখে গেছেন।"

দুজনে আবার একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর চম্পাই আবার কথা কহিল, বলিল—"আমি সব ঠিক ক'রে রেখেছি, এখন আপনার মতের অপেক্ষা। মানুষের কাছে আমাদের এ প্রবঞ্চনাটুকু না করলে চলবে না, হীরার কাছে আরও বেশি দরকার, ভেবে দেখুন আপনি।···অবশ্য এর মধ্যে একটা খুব বড় প্রশ্ন আছে—মাস্টারমশাই আপনাকে যে পথ ধরিয়ে গেছেন, সেই পথেই থাকবেন কি না!"

টুলু একটু ক্লান্ত কণ্ঠে বলিল—"আমার তো এখন সবই অন্ধকার; পথ আর কোথায়?"

"এই আট বছরের মধ্যে অনেক কিছুই ঘটেছে, ক্রমে ক্রমে শুনবেন; কিন্তু পথ আপনার আরও ভালো ক'রেই তোয়ের ক'রে গেছেন মাস্টারমশাই।"

টুলুর জেলে আগস্ট আন্দোলনের কয়েদীদের কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, সচকিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"তুমি জান মাস্টারমশাইয়ের এ দিককার কথা কিছু?"

"জানি, এ দিকে ক'টা মাস আমি তাঁর সঙ্গেই ছিলাম, কখনও এখানেই, কখনও মেদিনীপুর, তাঁর···"

টুলুর বিলম্ব সহিতেছে না, প্রশ্ন করিল—"মারা গেছেন, না?"

"হ্যাঁ।"

"পুলিসের গুলিতে? তিনটেকে শেষ ক'রে?"

"হ্যাঁ। সেইরকমই কানে গেছে আমার।"

টুলু চুপ করিল, ধীরে ধীরে তীব্র উৎকণ্ঠার ভাবটা মিলাইয়া গেল; শান্ত কণ্ঠে বলিল—"হ্যাঁ, কি বলছিলে, বলো।"

"মাস আষ্টেক আগে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়। তিনি আমাদের..."

টুলু বাধা দিয়া বলিল—"দেখা হয়, কোথায়? মেদিনীপুরে?"

চম্পা একটু থতমত খাইয়া গেল, বলিল—"না, অন্য এক জায়গায়।"

"কোথায়?"

চম্পা মুখে একটু অপ্রতিভ হাসি লইয়া চুপ করিয়া রহিল। টুলু চোখ অল্প ঘুরাইয়া মনে মনে একটা হিসাব করিয়া লইল, তাহার পর নিজেই বলিল—"যশোরে?"

চম্পা চুপ করিয়া রহিল। টুলু বলিল—"বেশ, বলো।...তিনি তোমাদের..."

"বাবা তখন বেঁচে, আমাদের তিনজনকে তিনি মেদিনীপুরে নিয়ে যান। শহরে নয়, শহর থেকে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরে, স্টেশন থেকেও দূরে একটা গ্রামে, নামটা সাগরদহ, একটা ছোট নদীর ওপরে। সেখানে প্রায় বছর দুয়েক আগে এসে মাস্টারমশাই একটা আশ্রমের পত্তন করেছেন। তাঁত, চরখা, ছেলে-মেয়েদের জন্যে একটা স্কুল, নাইট স্কুল বড়দের জন্যে; আমি যেতে মেয়েদের জন্যও একটা ব্যবস্থা ক'রে দিলেন..."

"এল পড়তে তারা?"

"অমন উৎসাহ আপনি দেখেন নি, গঞ্জডিহির সঙ্গে কোন মিল তো নেই-ই, অন্য কোথাও আমি অমনটা দেখি নি, যেন মাটিতেই কি আছে, সত্যি!..."

টুলু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—"অন্য আর কোন্ জায়গা দেখেছ তুমি?"

"কেন ?…বাঃ…কত জায়গায় তো…"

তাহার পর চুপ করিয়া দৃষ্টি নত করিল। টুলু অল্প একটু হাসিয়া বলিল—"বেশ, থাক্ ও-কথা, যা বলছ বলো।"

"কি যে বলছিলাম—হ্যাঁ, যেন মাটির গুণ। অথচ যাকে বলা হয় ভদ্দর-লোকের গ্রাম তা নয়, বেশির ভাগই চাষাভুষো—বাউরী, সদ্‌গোপ, সাঁওতালও আছে—ব্রাহ্মণ কায়েত গুনে-গেঁথে পাঁচ-সাত ঘর হবে। নাম রেখেছেন—'শান্তি আশ্রম'। এই শান্তি আশ্রমে যে আট মাস একটানা ছিলাম তা নয়, মাঝে মাঝে এখানে চ'লে আসতাম, মাস্টারমশাইও এসে থাকতেন। মাস্টারমশাইয়ের কিন্তু একটা লক্ষ্য করতাম—মাঝে মাঝে কোথায় চ'লে যেতেন, দু-পাঁচ-দশদিন থাকতেন, তারপর ফিরে আসতেন, এখানেই হোক বা আশ্রমেই হোক। প্রথমটা বুঝতে পারি নি, তারপর মনে সন্দেহ হ'ল, গঞ্জডিহিতে মাস্টারমশায়ের যা পদ্ধতি ছিল—একসঙ্গে দুটো জায়গা সামলানো, একটা নরম একটা গরম—বোধ হয় এখানেও তাই করছেন। সন্দেহটা যে সত্যি, সেটা টের পাওয়া গেল দিন কতক পরে। আগস্ট আন্দোলন শুরু হ'ল—মেদিনীপুরের আন্দোলন—ভেতরে থেকেও নিশ্চয় কতকটা আঁচ পেয়েছেন…মাস্টারমশাই মাসের গোড়াতেই চ'লে গিয়েছিলেন—সতেরো তারিখ হয়ে গেল, খবর নেই, মনটা বড্ডই খারাপ, নরোত্তম ব'লে একজন বাউরী সঙ্গে থাকত, সন্ধ্যের সময় এসে উপস্থিত—চুপি চুপি খবরটা দিলে—সাগরদহ থেকে প্রায় মাইল পঞ্চাশেক দূরে, জেলার একেবারে অন্যদিকে আর কি—সমস্ত তল্লাটটা গেছল খেপে, মাস্টারমশাই পুলিসের গুলিতে মারা যান—ওদিকেও জন আষ্টেক খুন-জখম হয়, তবে মাস্টারমশাইয়ের মৃতদেহ এরা সরিয়ে ফেলে, ওঁর বিশেষ হুকুম ছিল।"

টুলু প্রশ্ন করিল—"আর, তোমাদের ওখানে, সাগরদহের আশ্রমে ?"

"একেবারে ঠাণ্ডা। ওদিকেও চারিদিকে খুব হয়েছিল একচোট ; কিন্তু সাগরদহ, আরও খানকতক গ্রাম, আশ্রমের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ ছিল অল্পবিস্তর, একটু টুঁ শব্দ করে নি।…"

"কেন ?"

চম্পা গা ঝাড়া দিয়া সোজা হইয়া বসিল, একটু ব্যগ্রভাবে বলিল—"এই দেখুন, গল্প করতে গেলে সমস্ত রাতই কেটে যাবে। আপনি শুতে যান, অনেক রাত হয়েছে।"

নিজেও উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"কেন, তা ওখানে গেলে হয়তো টের পাবেন—যদি যান···নিন উঠুন।"

দোরের নিকট ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"হ্যাঁ, একটা কথা, কাল সকালেই আমরা চ'লে যাব। এর মধ্যে ভেবে আপনাকে ঠিক ক'রে ফেলতে হবে।"

"কি ঠিক করা ?···ও ! কোন্ পথে যাব ? সে আমার ঠিক হয়ে গেছে।"

২

আশ্রমটা নদীর একেবারে ধারে। চারিদিকের গাঢ় সবুজের মধ্য দিয়া, নদীর নীল ধারাটা বহিয়া গেছে। গঞ্জডিহি থেকে একটা মস্ত বড় পরিবর্তন। গঞ্জডিহির পর সাগরদহ রুক্ষ নিদাঘের পর বর্ষা ; শ্যামল, সরস, তৃপ্ত ; আট বৎসরের বর্ণতৃষা রসতৃষার পর এই রকমটিই টুলুর দরকার ছিল, পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অতীতের অনেকখানি যেন মন থেকে মুছিয়া গেল।

নদীর ধারে মুখ করিয়া টানা একটা চালা, মাঝে মাঝে বেড়া দিয়া ছোট বড় কামরায় ভাগ করা। একটায় চরখা তাঁত ; একটায় কাগজের কারখানা ; একটায় ছুতারখানা ; একটায় লোহার কাজ ; একটায় স্কুল, সকালে ছেলেমেয়েরা পড়ে, দুপুরে বয়স্থা মেয়েরা, রাত্রে পুরুষেরা ; এদের ব্যাচ করা আছে, একটা ব্যাচ সপ্তাহে দুইটা দিন করিয়া তালিম পায়।···

চালাটার সামনে একটা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, তাহার পরই নদী ; প্রাঙ্গণের এক পাশে, নদীর তীর ঘেঁষিয়া টুলুর বাসাটা। অনেকগুলি বিভাগ থাকিলেও কাজ খুব বেশী নাই, তাহার কারণ কাজ করার লোক আছে প্রচুর ; জন তিনেক

এখানেই থাকে, টুলুর মতো বাসা আছে ; বাকি সবাই গ্রাম থেকে আসে। টুলুর কাজ অনেকটা অধ্যক্ষের মতো—তদারক করা, চালাইয়া লইয়া যাওয়া, মাস্টার-মশাইয়ের যা কাজ ছিল। একটা কথা চম্পা টুলুকে আগেই বলিয়া দিয়াছিল—মাস্টারমশাইয়ের মৃত্যুর খবরটা জানে শুধু চম্পা আর নরোত্তম। বাকি সবাই জানে, তিনি যেমন মাঝে মাঝে যান সেই রকমই গেছেন, আবার ফিরিয়া আসিবেন।

কয়েকদিন ধরিয়া টুলু কিছুই করিল না, শুধু তৃষিত মরু যেমন করিয়া বর্ষার জলে নিজেকে অভিসঞ্চিত করে, তেমনি করিয়া চারিদিকের শান্তি দিয়া নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া লইতে লাগিল। সকালে বিকালে বাসার সামনে একটি শান-বাঁধানো চাতালে থাকে বসিয়া। নদীর ওপার থেকেই সবুজের সমারোহ,—গাঢ়, ফিকা ; আরও গাঢ়, আরও ফিকা ; তাহার উপরে যতদূর চোখ যায় স্বচ্ছ আকাশের নীল আস্তরণ ; এখানে ওখানে ঘনসন্নিবিষ্ট গাছের মধ্যে গোলপাতার ছাওয়া কুটির, কোথাও ডুইটা, কোথাও দশটা ; কোথাও আরও বেশি ; কাছের-গুলাতে শান্ত জীবনের মৃদু চাঞ্চল্য ; কেহ নদীতে নামিল, কেহ কলসী লইয়া দাওয়ায় উঠিতেছে, কেহ একটি নগ্ন শিশুর হাত ধরিয়া চপল গতিতে সরু আঁকা-বাঁকা পথ চলিতে চলিতে একটা কুটিরের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। মাঠে কয়েকটা গাভী ছাড়া ছাড়া হইয়া তৃপ্ত আলস্যে চরিয়া বেড়াইতেছে, একটা গুটাইয়া-গুটাইয়া রোমন্থনে নিরত।···একটা মাটির বাসনের নৌকা ওপারের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল।···কিছুই নয়, অথচ টুলুর দৃষ্টিকে যেন এক ধরনের নেশায় ফেলে আচ্ছন্ন করিয়া, যত তুচ্ছই হোক, যেন মহিমময়···চোখ ফেরানো যায় না, মনে হয় আরও ছবি ফুটুক, আরও দেখি······

পিছনে চলে চরখার একটানা সঙ্গীত, তাঁতের খটখট শব্দ তাল দেয়। টুলুকে এক-এক সময় দেয় অন্যমনস্ক করিয়া। মাস্টারমশাই চরখাতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। মনে পড়ে একেবারে গোড়ার দিকের একদিনের কথা, খনি হইতে উঠিয়া আসিয়া টুলু প্রশ্ন করিয়াছিল—"এগুলোকে বুজিয়ে দেওয়া যায় না সার্ ?"

উত্তরে মাস্টারমশাই বলিয়াছিলেন—"যদি সম্ভব হ'ত, তবুও উচিত হ'ত না টুলু—সভ্যতার চাকা পিছন দিকে ঘোরাতে যাওয়া অস্বাভাবিক, আর সেইজন্য বোধ হয় ভুলও।"

চরখার চাকা ঘোরানো কি সেই সভ্যতার চাকাকে পিছন দিকে ঘোরানো নয়? প্রশ্নটার বেশ মনের মতো উত্তর পাওয়া যায় না, টুলুর আলস্যের আনন্দ একটু মলিন হইয়া উঠে।

সকালে হীরক থাকে স্কুলে, বিকালে সামনের প্রাঙ্গণটায় দলবল লইয়া করে খেলা—এই দিক ঘেঁষিয়াই। টুলুর সন্দেহটা হয়তো ঠিক, ইচ্ছা করিয়াই চম্পা এই ব্যবস্থা করিয়াছে। চম্পা বুদ্ধিমতী, নিশ্চয় বুঝিয়াছে টুলুর এই যে আলস্য, ঔদাসীন্য, এটা নূতন জীবনের সামনে আসিয়া একটা দ্বিধায় পড়িয়া যাওয়ারই রূপান্তর,—হয়তো ঠিক করিতে পারিতেছে না, কোন্ পথে যাইবে। বাহিরে বাহিরে প্রশ্নটার মীমাংসা অবশ্য জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরদিনই হইয়া গিয়াছিল, সকালবেলা চম্পা যখন জিজ্ঞাসা করিল, টুলু উত্তর দিয়াছিল—"আমি যেমন জেল থেকে জেলে ঘুরেছি চম্পা, তুমি ছায়ার মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছ—তোমার অনেক দেশ দেখার ভেতরের কথাটা কি আমি বুঝতে পারি নি? এর পরেও কি আমি নূতন পথ ধরবার কথা ভাবতে পারি?"

টুলু সঙ্গে আসিয়াছে এইখানে, তবু চম্পার নিশ্চয় ভয় হয়। মুখে বলিয়াছে বলিয়াই যে অন্তরের দ্বিধা মিটিয়া গিয়াছে এমন তো নাও হইতে পারে; তাই হীরকের কাছে কাছে রাখিয়া গঞ্জডিহির জীবনের সঙ্গে টুলুকে নিবিড়ভাবে, সুনিশ্চিতভাবে বাঁধিয়া রাখিতে চায়; একটা কৌশল, হীরককে কাজে লাগানো।

হীরকের খেলার একটু নূতনত্ব আছে, এক এক সময় টুলুর দৃষ্টি ওপার থেকে সংযত হইয়া তাহাতেই নিবদ্ধ হইয়া যায়। এই বয়সের ছেলেদের সাধারণ যা খেলা সে দিকে বড় একটা যায় না, কিংবা গেলেও বেশিক্ষণ মন বসাইতে পারে না। ও একটি বালখিল্য বিপ্লবী। খেলনার মধ্যে একটি ছোট কংগ্রেস-পতাকা

আছে, সেটিকে কেন্দ্র করিয়া ওর মাথায় নানারকমের খেলার প্ল্যান গজায়,—কখনও সাথীদের লইয়া একটা মিছিল গড়িয়া আশ্রমের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়—স্লোগান আওড়াইয়া, কখনও কখনও গান বা ছড়া—জানা আছে অনেক রকম, পুরাপুরি কিংবা অংশত—রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল, আরও সবার—

"বল বীর,

বল উন্নত মম শির,

শির নেহারি আমারি নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির···"

পতাকা ধরে তুলিয়া, বুক দেয় চিতাইয়া, চলে গতির ছন্দে বিদ্রোহ জাগাইয়া। কখনও কখনও দুইটা দল গড়ে,—একটা ইংরেজ, একটা ভারতীয়, একটা গাছ বা মাটিতে আঁকা একটা বৃত্ত হয় কেল্লা, পেঁপের ডাঁটার কামান সাজানো হয়, তাহার মধ্যে দিয়া মুখের আওয়াজে দুম্ দুম্ করিয়া গোলা ফাটিতে থাকে। হারে ইংরেজ, কেন-না, ভারতীয় দলে থাকে স্বয়ং হীরক—হাতে কংগ্রেসের পতাকা লইয়া।···কখনও ইতিহাস আসিয়া পড়ে—শিবাজী, তোরণ দুর্গ অবরোধ।···কখনও পুরাণ—গাভীর মধ্যে সীতাকে রাখিয়া দুই ভাইয়ে স্বর্ণ হরিণের মৃগয়ায় যায় বাহির হইয়া। রাবণ আসিয়া হয় উপস্থিত, ছল বিস্তার করে। রামায়ণের সঙ্গে এই পর্যন্তই থাকে মিল, তাহার পর আর ধৈর্য থাকে না; সীতাকে ধরিবার সঙ্গে সঙ্গেই দুই ভাই মৃগয়া ছাড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হয়, রামের হাতে কংগ্রেসের পতাকা; সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শেষ হইবার অনেক আগেই রাবণকে ধরা চুম্বন করিতে হয়।

আরও অনেক রকম খেলা, সবগুলাতেই মাস্টারমশাইয়ের হাত স্পষ্ট, কোন খেলাটা হয়তো সমস্তটা গড়িয়া অভ্যাস করাইয়া দিয়াছেন, কোনটার ভঙ্গি দেখাইয়া দিয়াছেন, কোনটা—যেমন সীতা-হরণেরটা—হীরক গল্প থেকে নিজের মৌলিক প্রতিভায় গঠন করিয়া লইয়াছে। অনেক জায়গা ঘুরিয়াছে, চারিদিকেই আন্দোলনের হাওয়া, স্লোগান, উত্তেজনা—তাই থেকেও সংগ্রহ হইয়াছে অনেক কিছু। টুলু এক-এক সময় অতিনিবিষ্ট হইয়া দেখে, এক-এক সময় অন্যমনস্ক হইয়া

যায়। মাস্টারমশাই এই ছেলেটিকে একেবারে নিজের মনের মতো করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্তটা অনমনীয় দর্পে ভরা। এমনি বোঝা যায় না, কেন-না, স্বভাবটা বড় মিষ্ট মোলায়েম, কিন্তু কোথাও একটু সন্দেহ হইলে, একটু অন্যায় বাধা পাইলে এই অষ্টম বর্ষীয় শিশুটি ঘাড় বাঁকাইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া "কেন?" বলিয়া এমনভাবে দাঁড়াইয়া পড়ে যে, তাহার ভিতরের অনেকটাই নিজের রূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে। ছড়াগুলা নিশ্চয় সব মাস্টার-মশাইয়ের শেখানো, সব এক স্থর—টুলু একটাও এমন শুনিল না যাহাতে দীনতা আছে, একটু হা-হুতাশ আছে বা একটু প্রার্থনা আছে; ঈশ্বরের সম্বন্ধেও গোটা-দুই ছড়া জানে, কিন্তু তাহাতে দয়া ভিক্ষা নাই, দীনভাবে কোন কিছু প্রার্থনার নামগন্ধ নাই; আছে শুধু তাঁহার বিরাট মহিমার একটা আলোকোজ্জ্বল চিত্র। হীরক যেন মাস্টারমশাইয়ের মনের নব-অঙ্কুর।

টুলু বলিল—"চম্পা, ছেলে তোমার এখানে বেশ একটু বেমানান বাপু, কতকটা যেন বাল্মীকির আশ্রমে ক্ষত্রিয়কুমার লব…"

চম্পা উত্তর করিল—"আপনি অত রেখে-ঢেকে বলছেন কেন? তবে বেমানান নয়, নিশ্চয় বলতে পারি এটুকু।"

টুলু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতে বলিল—"বাল্মীকির আশ্রমটা গোড়ায় রত্নাকর ডাকাতের আড্ডা ছিল, পরে হ'ল আশ্রম; এটা এখন আশ্রম আছে, পরে হীরক ডাকাতের আস্তানা হয়ে উঠবে।…আশ্চর্য, নামেও কি মিলে যেতে হয় গা?…আরও আস্পর্ধা বাড়িয়েছেন নিজে সঙ্গে খেলে খেলে। আপনাকে টানে নি এ পর্যন্ত ডাকাত?"

একদিন টানিল, খেলার মধ্যে হঠাৎ আসিয়া, ওর নিজস্ব পদ্ধতিতে গলা জড়াইয়া মুখটা মুখের কাছে আনিয়া বলিল—"বাবা, তুমি চিতোর রাণা হবে?… হ্যাঁ, হও; দাদু হতেন—"

টুলু হাসিয়া বলিল—"রাতারাতি এত বড় পদবীর কথা যে আবুহোসেনও ভাবতে পারত না হীরা!"

"হ্যাঁ, হও; তুমি জিতবে, আমি ব'লে দিচ্ছি; হ্যাঁ, চলো লক্ষী বাবা।"

টানিয়া লইয়া গেল। একটা মাটির ঢিবি, তাহার চারি কোণে আরও চারিটা ঢিবি, সব কয়টা ঘিরিয়া একটা আধ হাত উঁচু দেয়াল। মাঝখানের ঢিবিটার চূড়ায় কংগ্রেসের পতাকাটা পোঁতা। দূর থেকেই দেখাইয়া বলিল—"ওইটে বুঁদির কেল্লা বাবা—নকলগড়। তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে এই রকম ক'রে বুকে হাত দিয়ে বলো—

'জল স্পর্শ কোরব না আর
চিতোর রাণার পণ,
বুঁদির কেল্লা মাটির 'পরে
থাকবে যতক্ষণ।' "

টুলু হাসিয়া বলিল—"বেশ, বললাম।"

"আমি হচ্ছি কুম্ভ, বাবা, কেমন তো?

'হারাবংশী বীর—
হরিণ মেরে আসছে ফিরে
স্কন্ধে ধনুক তীর।' "

বীরত্বব্যঞ্জক একটা দৃষ্টি হানিয়া বলিল—"তুমি দাঁড়াও বাবা এখানে।"

একটু পরেই তীর-ধনুকে সাজিয়া আসিয়া আবার দর্পিত ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া টুলুর পানে চাহিয়া বলিল—"কে রে,

নকল বুঁদি কেল্লা মেরে
হারাবংশী রাজপুতেরে
করবে নতশির?
নকল বুঁদি রাখব আমি
হারাবংশী বীর!

বাবা তুমি এসো, ভাঙবে এসো কেল্লা, দিব্বি করেছ, মনে নেই?...তোরাও সব আয় বাবার সঙ্গে; আমি একলা কুম্ভ।"

টুলু অবশ্য গেল না, ছেলেরা বাঁখারির তলোয়ার লইয়া আগাইয়া গেল। হীরক বলিল—"এসো বাবা তুমি, ভয় নেই, তীর আমি ওপর দিকে ছুঁড়ব। আর, তুমি তো মরবে না যুদ্ধে, মরব আমি কেল্লা বাঁচাতে বাঁচাতে।"

তাহার পর হাঁটু গাড়িয়া ধনুক তুলিয়া বলিল—

"বুঁদির নামে করবে খেলা ;
সইব না সে অবহেলা—
নকল গড়ের মাটির ঢেলা
রাখব আমি আজ—

এইবার এসো বাবা···চিতোর-রাণাকে তোরা একটা তলোয়ার দে না রে··· ও কি, কোঁচা ধ'রে রয়েছ কেন বাবা ?"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, মুখ হাত মুছিবার জন্য ডাকিতে আসিল চম্পা, বলিল—" 'নকলগড়' খেলা হচ্ছে ? বাবার সঙ্গে এইটে ছিল সব চেয়ে বড় খেলা ; কী নাতিই গ'ড়ে গেছেন !···নাও, আর দয়া ক'রে গড়িয়ে প'ড়ে গিয়ে কাজ নেই বীরপুরুষের ; এমনিই ধূলো মেখে ভূত হয়ে উঠেছ।"

৩

চম্পার যেন একটা নূতন রূপ ফুটিয়াছে। আট বৎসরের কঠোর কৃচ্ছ্র তাহার দেহে একটা সুস্পষ্ট ছাপ দিয়া গেছে। টুলুর জেল বদলির সঙ্গে সঙ্গে চম্পা ছয়টা জায়গায় ঘুরিয়াছে এই আট বৎসরে। গণ্ডডিহির ঘটনার প্রায় মাস চারেকের মধ্যে বনমালী হঠাৎ মারা যায়। কাজ ছাড়িয়া চরণদাস বরাবর কন্যার সহিতই ছিল, কাজ আর নেশা ছাড়ার পর থেকে তাহার শরীরটাও যায় ভাঙিয়া ; অকর্মণ্য পিতা, হীরক আর নিজে—এই তিনটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইতে তাহাকে বছর খানেক অসম্ভব রকম পরিশ্রম করিতে হয় ; ভদ্রভাবে প্রচ্ছন্নভাবে করিতে হইত বলিয়া পরিশ্রমটা ছিল আরও সুকঠোর। দ্বিতীয় বৎসর একটা

কঠিন পীড়ায় পড়িয়া দিন পনরো হাসপাতালে পড়িয়া থাকিতে হয় তাহাকে; সেই থেকেই নার্স হইবার খেয়ালটা ঢুকিল তাহার মাথায়। দিনকতক শিক্ষানবিসি করিয়া একটা সার্টিফিকেট লইল। তাহার পর থেকে টুলু যেখানেই বদলি হইয়াছে, চম্পা গিয়া জেলের কাছাকাছি একটা বাসা ভাড়া করিয়া এক বছর দুই বছর অথবা তাহার চেয়েও কমবেশি যেমন দরকার হইয়াছে থাকিয়া নার্সগিরি করিয়া চালাইয়াছে। আগে বোধ হয় ইচ্ছা ছিল, টুলুর সঙ্গে একটা যোগসূত্র রাখিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু তাহার জন্য যে মূল্য দিতে হইত তাহা কল্পনাতীত হওয়ায় ও-সঙ্কল্পটা বরাবরের জন্য ছাড়িয়া দেয়; কাছে থাকার তৃপ্তি ও আশ্বাস লইয়া এই দীর্ঘ আট বৎসর কাটাইয়া দিয়াছে।

নার্সগিরি থেকে ছোট্ট সংসারটির মধ্যে স্বচ্ছলতা আসে ভালরকম, তাই থেকে ভদ্রতা, যাহার দিকে বেশি নজর ছিল চম্পার, বিশেষ করিয়া হীরকের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া। কিন্তু অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে সেজন্য—অনিয়ম. রাতজাগা, ক্রমাগতই রুগ্নের নিরানন্দ সাহচর্য,—আর সমস্তটাই একটানা বিষাদের পট-ভূমিকায়। দৃষ্টিতে আসিয়াছে ক্লান্তি, দেহে কৃশতা, কাঠিন্য। আট বৎসর পরে চম্পাকে চিনিতে অবশ্য ভুল হইল না, তবু এটা ঠিক যে, সে চম্পার সঙ্গে মিল আছে অল্পই।

তবে, আশ্চর্য রকম মিল হইয়াছে এই নূতন আবেষ্টনীর সঙ্গে, এই অভিনব কর্মজীবনের সঙ্গে। এইখানেই ওর নূতন রূপের বিকাশ, ওর সৌন্দর্য মোহনীয় থেকে বরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। স্বভাবের মধ্যে ধর্মপ্রবণতার জন্য চোখ তুলিয়া নারী-সৌন্দর্য দেখার অভ্যাস টুলুর কখনই ছিল না, আজকাল কিন্তু দেখে—মুগ্ধ দৃষ্টিতেই—চম্পা যখন থাকে কর্মব্যস্ত, যখন কর্মশ্রান্ত হইয়া ফেরে, অথবা যখন কাজের তাগিদে কোথাও বাহির হয়, দৃষ্টিতে উৎসাহ, চিন্তা, স্বপ্ন। চোখাচোখিও হইয়া গেছে কয়বার, চম্পা রাঙিয়া ওঠে লজ্জায়, টুলুর চাহনিতে যে প্রশংসা সেটা কাটান্ দেওয়ার জন্যই বলে—"দেখছেন কি, আমার দ্বারা আর হচ্ছে না, এত বাড়াবাড়ি ক'রে গেছেন মাস্টারমশাই!..."

দুপুরে মেয়েদের পড়াইয়া বাহির হইয়া যায়। সব ক'টা গ্রামের সঙ্গেই ওর

যোগ, প্রত্যেকটি ঘরের সঙ্গে,—কোথাও অভাবের ছিদ্র বুজাইয়া, কোথাও রোগে সেবা বিলাইয়া, কোথাও বা স্কুলের অতিরিক্ত কোন শিল্প শিক্ষা দিয়া সন্ধ্যার মুখে ফেরে। বাইরের কর্মজীবন এক-একদিন এইখানেই শেষ হয়, এক-একদিন বাকি থাকে। হীরক আর টুলুকে আহার করাইয়া, নিজে আহার শেষ করিয়া, অথবা কিছু না খাইয়াই চম্পা বাহির হইয়া যায়—কোথাও হয়তো নূতন প্রসূতি, হয়তো সেবাই করিতে হইবে কোন রুগ্নের সমস্ত রাত্রি জাগিয়া। টুলু নিবারণ করে না, তবে বাড়াবাড়ি হইলে কখনও কখনও একটু মৃদু অনুযোগ করে—নিজেকে বাচাইয়া অপরের সেবা করিতে হইবে তো ? অপরের সেবা করিবার জন্যও তো নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে ? এমনভাবে করা ভালো নয় কি, যাহাতে শেষে নিজের সেবারই দরকার না হইয়া উঠে ?···

একদিন এই প্রসঙ্গেই হঠাৎ একটা নূতন ধরনের খবর পাইয়া গেল টুলু। পাশের গ্রামে একটি ছেলের শুশ্রূষা লইয়া কিছুদিন হইতে খুব খাটুনি যাইতেছিল। ছেলেটি একটি বিধবার একমাত্র সম্বল। চম্পা যেন জীবনমরণ পণ করিয়া যমের সঙ্গে লড়াই শুরু করিয়া দিয়াছিল, শেষের দিন আসিল একেবারে তিন দিন পরে ; সঙ্কট অবস্থা যাইতেছিল ছেলেটির, একটু ভালোর দিকে যাইতে চম্পা একবার বাসার অবস্থাটা দেখিয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে।

টুলু বাহিরে বসিয়া ছিল, আতঙ্কিত হইয়াই বলিল—"এ কি হয়েছে চেহারা তোমার চম্পা !"

চম্পা একটু হাসিয়া বলিল—"আমি আশা করেছিলাম আপনি ছেলেটার কথা আগে জিজ্ঞাসা করবেন।"

"তা হ'লেই অবস্থাটা বোঝো ; তোমার মুখের চেহারা দেখে কি আগে করা উচিত সেটাও ভুলে যেতে হয় লোককে।"

চম্পা একটু হাসিল, বলিল—"একেবারে এতটা নিশ্চয় নয়, তবে কাল-পরশু সত্যি ভীষণ অবস্থা গেছে, বিধবার ঐ শিবরাত্রির সলতে তাকে সামলাতেই··· হ্যাঁ, হীরা কোথায় ?"

"সে পড়ছে।"

"খেলার সময় পড়া—তার মানে রাগ হয়েছে বাবুর!"

"তা হয়েছে রাগ; কাল ভাঙাতে পেরেছিলাম, আজ দেখলাম, বেশি চেষ্টা করতে গেলে বাড়াবাড়ি হয়ে উঠবে, সামলাতে পারা যাবে না; হাল ছেড়ে ব'সে আছি।...তাই ব'সে ব'সে ভাবছিলাম। আর একজন যদি তোমার পাশে থাকত, বেঁটে নিত তোমার কাজের খানিকটা, অন্তত হীরার দিক দিয়ে দরকার হয়ে পড়েছে।"

চোখ তুলিয়া চম্পা ক্ষণমাত্র কি যেন একটা ভাবিল, বলিল—"হ'লে তো খুবই ভালো হ'ত, কিন্তু হচ্ছে কোথা থেকে?...যাই, দেখিগে।"

একটু দেরি হইল, তাহার পর দুইজনে বাহির হইয়া আসিল, হীরক চম্পাকে জড়াইয়া আছে। চোখ দুইটা ভিজা, তবে মুখে একটু হাসি ফুটিয়াছে। চম্পা অল্প হাসিয়া বলিল—"হীরাবাবুকে কি ব'লে ঠাণ্ডা করলাম জানেন? শোনা দরকার আপনার; বললাম—আর একজন ভালো মায়ের ব্যবস্থা ক'রে দোব, সর্বদা আগলে..."

চম্পা হঠাৎ থামিয়া গেল, বলিল—"দেখুন। ভাগ্যিস হীরা রাগ করেছিল, নইলে ভুলেই যেতাম কথাটা। আমি নরোত্তমের মুখে শুনলাম সেদিন, তারপর এইসব গোলমালে আর আপনাকে মনে ক'রে বলাই হয় নি। মাস্টারমশাই মারা যেতে আমি যখন চ'লে যাই হীরাকে নিয়ে, একটি ভদ্রঘরের মেয়ে আশ্রমে আসেন, বলেন—মহকুমার মেয়ে-স্কুলের মিস্ট্রেস তিনি, বাইরে আমাদের আশ্রমের সুনাম শুনে এসেছেন। বেশ খানিকক্ষণ থেকে, আশ্রমের কাজ ভালো রকম দেখে-শুনে, গ্রামে বেশ খানিকটা ঘুরে চ'লে যান। ব'লে যান, মাস্টারমশাই ফিরে এলে যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়, দরকারী কাজ আছে।"

দুইজনে পরস্পরের মুখের পানে একটু চাহিয়া রহিল, চম্পা জিজ্ঞাসা করিল—"কি মনে হয় আপনার?"

"আশ্রমের কাজ করবার ইচ্ছে মনে করছ?"

"আশ্চর্য কি ?"

"কত বয়েস বললে নরোত্তম ?"

"বললে, প্রায় আমার বয়সী, এক-আধ বছরের বড় হতে পারে।"

"আর ?"

"আর কি ?—সংসারে কে কে আছে ? তা আর ও কি ক'রে জিজ্ঞেস করবে?"

টুলু একটু অন্যমনস্ক হইয়াই প্রশ্নটা করিয়াছে, বলিল—"তা বটে।...এসে থাকবেন—এটা বোধ হয় বেশি আশা করা হয়, তবে উদ্দেশ্যটা কি জানতে পারলে ভালো হ'ত, কিন্তু উপায় কি ? মাস্টারমশাই এলে পরে তো খবর দিতে বলেছিলেন ? ওইখানেই যে পথ বন্ধ হয়ে গেল।"

দুইজনে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর চম্পা প্রশ্ন করিল—"আমি একটা কথা বলব ?"

"কি, বলো।"

"ধরুন, আপনি যদি যেতেন একবার—"

"ফল কি ? যদি উদ্দেশ্য থাকে এসে থাকবার তো সে নিশ্চয় মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে, তিনি বয়স্থ মানুষ ; আমার সঙ্গে থাকবেন না নিশ্চয়, যদি একলা হন। ধরা যাক, একলা নয়, এসে রইলেন, আমাদের তরফ থেকে বিপদ হচ্ছে মাস্টার-মশাইয়ের মৃত্যুর কথাটা জেনে যাবেন শেষ পর্যন্ত।"

"না-হয় গেলেন, তিনজনের জায়গায়, না-হয় চারজন জানলে ; শিক্ষিতা মেয়ে-ছেলে, গোপন রাখবার উদ্দেশ্যটাও বুঝবেন, রাখতেও পারবেন গোপন।"

আবার দুইজনে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর চম্পা হঠাৎ একটু অসহিষ্ণু হইয়া আবদারের স্বরে বলিল—"না, আপনি যান একবার, আমার লোভ হচ্ছে, পড়ানোর ভারটা যদি তিনি নেন—নিজে শিক্ষিতা...আর দেখুন না, এই তিনটে দিন আটক প'ড়ে গেলাম, ক্ষতি হ'ল তো। যান আপনি, সত্যি।"

টুলু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল, ছেলেমানুষি ভাবে চম্পার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"একটু ভেবে দেখতে দাও, অত সহজ কি !"

৪

অন্যমনস্ক হইয়া পড়িবার একটু কারণ ছিল, টুলুর একটি ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ বৈকালের কথা মনে পড়িয়া গেছে; গঞ্জডিহিতে মাস্টারমশাইয়ের বাসা—প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ছইওয়ালা গোরুর গাড়ি থেকে নামিল রতন, কানন আর তাহাদের ভগ্নী; —বাইরে উতলা প্রকৃতি, ঘরের মধ্যে সেই বাক্যহীন মুহূর্তগুলি—তাহার পরই দৃশ্যপটের একেবারে পরিবর্তন; বর্ষাধৌত, স্নিগ্ধ আকাশের নিচে স্কুলের বাগানে ছেলেমেয়ের দল, উল্লাসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, অতটা উদ্দাম না হোক, তবু এই একটু আগের ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে কোথায় যেন আছে একটা মিল, রতনের বোনের সেই বিস্মিত আনন্দবিহ্বল কথাগুলি—"বড় চমৎকার লাগছে আমার—স্কুলের সঙ্গে বাগান!—ছেলেরা নিজেই করে আবার!" তাহার পর সেই বিদায়ের দৃশ্যটুকু—সবশেষে রতনের হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসা—"একবার উঠবেন?··· দিদি জিগ্যেস করলেন, আপনার স্কুলে তাঁকে পড়াতে দেবেন?···"

তিন দিনের পরে মাকে পাইয়া হীরকের উৎসাহটা সুদে আসলে আসিয়াছে ফিরিয়া, চম্পা ভিতরে চলিয়া গেল···কংগ্রেস-পতাকাটা ভুলিয়া গিয়াছিল, ভিতর থেকে আসিয়া ত্রস্ত পদে বাহির হইয়া গেল—একটা রাজ্য জয় করিতে হইবে, বিলম্ব হইয়া গেছে যেন।

টুলু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, ঐ একটি সন্ধ্যার বার্তা লইয়া গঞ্জডিহি বহু দিন পরে এক অপরূপ মোহে আসিয়া সামনে দাঁড়াইয়াছে—স্মৃতি কখনও এত মিষ্ট হইয়া দেখা দেয় নাই টুলুর জীবনে, কেন ঠিক ধরিতে পারিতেছে না···সমস্তটুকুর মধ্যে কোন্‌খানটা সব চেয়ে মিষ্ট?—সেই হঠাৎ ঝঞ্ঝা, কি রতন-কাননের কুণ্ঠিত সলজ্জ দৃষ্টি, কি তাদের বোনের সেই বিস্ময়, কি মুক্ত স্বচ্ছ আকাশের নিচে ছড়ানো তাহার স্কুলের সেই অংশটুকু?·· মনে হয়, সবের মধ্যেই কোথায় কি যেন অনির্বচনীয় আছে একটা—সমস্তটুকুর উপর যাদুস্পর্শ বুলাইয়া দিয়াছে···

টুলু চিন্তা-স্রোতকে ঘুরাইল, একবার সাঁকরেলে গিয়া উপস্থিত হইলে কেমন হয়? মহকুমার স্কুলের এই শিক্ষয়িত্রীর মতোই সেও নিজের মুখেই বলিয়াছিল, আসিয়া পড়াইবে। উৎসাহটা টুলুর এত বাড়িয়া গেল, কোনও বাধাকেই যেন বাধা বলিয়া মনে হইতেছে না; যাইবে, গিয়া অকপট চিত্তে সমস্তটা খুলিয়া বলিবে—আট বৎসরের অবকাশ বেশ একটি অন্তরাল সৃষ্টি করিয়াছে—কত পরিবর্তন হইয়াছে মানুষের মনে কে বলিতে পারে? যেখানে কোন গলদ নাই সেখানে কেন করিবে না বিশ্বাস, সত্য কেন চিরকাল এইভাবে ভীরু অবগুণ্ঠিত হইয়া থাকিবে? টুলু করিবে চেষ্টা, চম্পার মতো তাহারও লোভ হইতেছে। আর, লোভ যে এত মিষ্ট—এ সংবাদ তো এর আগে জানা ছিল না!

দিন দশেক পরের কথা। সাঁকরেলে যাওয়া হয় নাই, সেদিনের উৎসাহটা সেদিনকার সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই স্তিমিত হইয়া গেছে। সংকল্পটা একেবারে ছাড়ে নাই হয়তো, তবে দ্বিধা আসিয়াছে, বাধা যে কত বেশি সেটা উপলব্ধি করিতে করিতেই দশটা দিন কাটিয়া গেছে।

সকালবেলা টুলু স্কুল থেকে ফিরিয়া জামা ছাড়িতে যাইবে, একটি ছইওয়ালা গোরুর গাড়ি আশ্রমের বাহিরে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। ভদ্রবেশে একটি স্ত্রীলোক ভিতরে বসিয়া আছে দেখিয়া টুলু পা চালাইয়া বাসায় চলিয়া গেল, চম্পাকে বলিল—"দেখো তো, বাইরে কে এলেন, ভদ্রঘরের মেয়ে…"

চম্পা রান্নাঘরে ছিল, হাত ধুইয়া কাপড়ে মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া কৌতূহলদীপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"স্কুলের সেই মিস্ট্রেস্ নয়তো?"

"হতে পারে, যাও শিগ্‌গির।"

একটু পরেই চম্পা মহিলাটিকে লইয়া প্রবেশ করিল। উৎসাহভরে গল্প করিতে করিতে আসিতেছে, বলিল—"তিনিই ইনি…কোথায়?…হীরা, কোথায় গেলে? এসো, প্রণাম করো'সে।"

টুলু ঘরের মধ্যে জামার বোতাম খুলিতেছিল, সেখান হইতেই মহিলাটিকে,

উঠানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া স্তব্ধভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর তাহার সমস্ত শরীরের রক্ত যেন নামিয়া গেল—সাঁকরেলের সেই মেয়েটি, কলঙ্কিত মুখ লইয়া সামনে দাঁড়াইতে পারা যাইবে না বলিয়া যাহার বাড়ির প্রায় দরজা থেকেই ফিরিয়া আসিয়াছিল সেদিন—আট বৎসর আগে, জীবনের সেই সবচেয়ে মোক্ষম রাত্রিটিতে। কী দুর্যোগ! যাহার জন্য কলঙ্ক, সেই চম্পাই আজ তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহার সামনে উপস্থিত করিতেছে! ভাবিবার সময় নাই, পলাইবার পথ নাই, কয়েদখানার সেলের মধ্যেও এত নিরুপায় বোধ হয় নাই টুলুর।···চম্পা হাসিতে হাসিতে উঠিয়া আসিল, মহিলাটির ডান হাতখানি ধরিয়া আছে, আসিয়া টুলুর দিকে চাহিয়া বলিল—"তিনিই, আমাদের আন্দাজ ঠিকই।"

মহিলাটি নমস্কার করিয়া স্থিরদৃষ্টিতে একটু চাহিয়া রহিল, একটা স্মৃতিকে যেন স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার পর প্রশ্ন করিল—"আপনাকে কোথাও দেখেছি কি এর আগে?"

টুলু আত্মগোপনের শেষ চেষ্টা করিল, একটু চিন্তা করিবার ভান করিয়া উত্তর করিল—"কই, মনে পড়ছে না তো!"

মহিলাটির মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল—"হ্যাঁ, দেখেছি, আপনার মনে পড়েছে না। গঞ্জডিহিতে হেডমাস্টারমশাইয়ের বাসায় হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি এসে পড়তে অমরা গিয়ে উঠলাম···"

টুলু একবার চম্পার পানে চাহিল, হাসি তো নাই-ই তাহার মুখে! মনে হইতেছে, এ মুখে জীবনে যেন কখনই হাসি ফোটে নাই।

মহিলাটি নব আবিষ্কারের আনন্দে আপন মনেই বলিয়া চলিয়াছে—"সেই আপনার স্কুল দেখলাম, ছেলেদের সেই বাগান···এবার নিশ্চয় মনে পড়েছে আপনার—অবিশ্যি অনেক দিনের কথা হ'ল, কিন্তু আমার মনে তো ছবির মত ব'সে রয়েছে সমস্তটুকু—বড্ড ভালো লেগেছিল···পড়ছে না মনে আপনার?"

চম্পা আড়চোখে একবার টুলুর পানে চাহিয়া লইয়া অন্য দিকে মুখটা ফিরাইয়া লইল।

টুলু যেন কড়া উকিলের জেরার পড়িয়া নিরুপায়ভাবে বলিল—"হ্যাঁ, পড়ছে এবার একটু একটু।"

মুখে একটু আনন্দ টানিয়া আনিবারও চেষ্টা করিল। মহিলাটি বলিয়া চলিল—"আপনাকে কথা দিলাম—আপনার স্কুলে পড়াব, কিন্তু কপাল দেখুন, বাড়ি গিয়েই দেখি, মার অসুখের বাড়াবাড়ি,—ভুগতেনই বড্ড, হঠাৎ এত বাড়াবাড়ি হ'ল যে, দিন তিনেকের মধ্যে মারা গেলেন। আমাদেরও সাঁকরেলের সঙ্গে সেই যে সম্বন্ধ ঘুচল, আজ পর্যন্ত আর যাওয়া হয় নি।"

নিশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতেছিল টুলু, বন্ধ নিশ্বাসকে ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া দিল; দুঃসাহসে ভর করিয়া একটা প্রশ্নও করিয়া বসিল—"গঞ্জডিহিতে যা যা ঘটেছিল—স্কুল নিয়ে—তার কিছুরই খবর রাখেন না বোধ হয়?"

"না তো, কি ঘটেছিল? রতন-কাননও তো তারপর আর যায় নি স্কুলে, জানব কোথা থেকে?"

টুলুর চৈতন্য হইল, ভয়ের মধ্যে প্রশ্নটা বড় বেখাপ্পা হইয়া গেছে। চম্পাও আর একবার আড়চোখে দেখিল। টুলু ঢোঁক গিলিয়া বলিল—"না, তেমন আর কি! ...মাস্টারমশাই কাজ ছেড়ে দিলেন—গঞ্জডিহির মতন জায়গায় সেইটেই তো বড় খবর একটা। আমিও তার পরেই চ'লে এলাম।"

হীরক ছিল না বাসায়, কে আসিয়াছে খবর পাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত হইল। চম্পার নির্দেশে মহিলাটিকে প্রণাম করিতে সে মুখটা তুলিয়া ধরিয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া দেখিল, তাহার পর টুলুর মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনাদের ছেলে? বড় চমৎকারটি তো!"

টুলু একটু হাসিয়া হীরকের মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"হুঁ।"

'চমৎকার' সম্বন্ধেও হয়, আবার ছেলেকে স্বীকার করাও হইল চলে, তাহার পর হঠাৎ আর একটা দুঃসাহসের প্রশ্ন করিয়া বসিল—"ওর মাকে আপনি দেখেছিলেন সেখানে?"

মহিলাটি চম্পার দিকে একবার চাহিয়া লইয়া বলিল—"না তো। কই, আপনার বাসায় তো ছিলেন না তখন; ছিলেন নাকি?"

টুলু যেন মরিয়া হইয়া গেছে, এসপার-ওসপার একটা কিছু হইয়া যাক, প্রশ্ন করিল—"গঞ্জডিহিতে কখনও দেখেন নি?—কোথাও? ভালো ক'রে দেখুন তো?"

বেশ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন। মহিলাটি বিমূঢ়ভাবে চম্পার মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। চম্পা যেন ফাঁসির হুকুম শুনিবে এবার, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া উঠিয়াছে। টুলুর দিকে ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরাইয়া মহিলাটি বলিল—"কই, মনে পড়ছে না তো; গঞ্জডিহিতে আমি গেছিও তো কম—সাঁকরেলে গিয়ে পর্যন্ত বোধ হয় বার চারেকও হবে কি না সন্দেহ—একবার ভাইদের ভর্তি করতে, একবার সেই ঝড়বৃষ্টির দিন, আর বোধ হয় বার দুয়েক—বাজার থেকেই ঘুরে আসা।"

টুলুর কানে গেল তাহারই মত একটা রুদ্ধশ্বাস চম্পার নাসারন্ধ্র হইতে ধীরে ধীরে মুক্ত হইল।

ইহার পর কথাবার্তা ক্রমে বেশ সহজ হইয়া আসিল। মহিলাটি নিজের নাম বলিল—তটিনী। সাঁকরেল ছাড়িয়া মামার বাড়িতে যায়—সুবিধা হয় না। দুইটি ভাইকে লইয়া কলিকাতায় এক মেয়ে-হোস্টেলে থাকিয়া পড়াশুনা করে—ভাই দুইটিকে লইয়া থাকিবার বিশেষ অনুমতি লইয়া, আই. এ. পর্যন্ত পাস দিয়া এখানে চাকরি লয়, শিক্ষকতা করিতে করিতেই বি. এ. পাস দিয়াছে। ভাই দুইটি কলিকাতায় পড়ে, রতন বি. এ. দিবে এবার, কাননের থার্ড ইয়ার।

দুপুরবেলা তিনজনে আশ্রম ঘুরিয়া বেড়াইল, গ্রামেও কোথায় কি কাজ হইতেছে দেখাইল চম্পা। তাহার পর বৈকাল হইতেই তটিনী বিদায় চাহিল; দশ-বারো মাইল যাইতে হইবে—এইতেই রাত্রি হইয়া যাইবে।

খানিকটা দূর পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া বাসায় ফিরিয়া টুলু চম্পার কপালের সিঁদুরের পানে চাহিয়া একটু যেন বিষণ্ণ কণ্ঠেই বলিল—"আজ তোমার প্রবঞ্চনাটা বড্ড স্পষ্ট হয়ে উঠল।"

চম্পা সেইদিনের উত্তরটাই দিল, তবে টুলুর মুখে এই দ্বিতীয় উল্লেখ বলিয়া একটু ব্যথিত কণ্ঠেই ; বলিল—"কি উপায় বলুন না আপনি ?"

তাহার পর একটু থামিয়া বলিল—"আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, এ বঞ্চনায় ঈশ্বর আছেন আমার সাক্ষী।"

৫

অল্প অল্প করিয়া কাজে বেশ মন বসিয়াছে। সকালে ছেলেদের পড়ায়, তাহার পরে বাগান। আমাড় জমি, নিচেই নদী, ছেলেমেয়ের সংখ্যাও ঢের বেশি, গঞ্জডিহির তুলনায় এখানকার এদের কৃষি বিষয়ে বেশ একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, খানিকটা দক্ষতাও ; এখানকার তুলনায় গঞ্জডিহির বাতাসটা খেলাঘর বলিয়া মনে হয়। আহারাদির পর তাঁতখানায় চরখাঘরে থাকে, জিনিসটাকে মনের সঙ্গে বেশ খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছে না, কেমন যেন মনে হয়, এ কোন্ সুদূর অতীতে পিছাইয়া যাওয়া—মাস্টারমশাইয়ের জীবনদর্শনের সঙ্গে যেন মিল খুঁজিয়া পায় না। বোঝে, সাগরদহের মতো জায়গায় এর সার্থকতা আছে. তবু প্রশ্ন জাগেই মনে—আর কেউ হইলে মানাইত, মাস্টারমশাই কেন এই নিথর নিঝুম শান্তির মন্ত্র দিয়া গেলেন এখানে ? আগস্ট-আন্দোলনের অত বড় বিপ্লব হইয়া গেল চারিদিকে, এরা এখানে বসিয়া চরখা ঘুরাইয়া গেছে, একটি একটি করিয়া টানার গায়ে পোড়েনের সুতা জুড়িয়া গেছে।

তবুও জিনিসটা কৌতূহল জাগায় ; দেখে প্রশ্ন করে, নিজেও কখনও কখনও বসিয়া যায়। এখান থেকে বাহির হইয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে—এইটে লাগে সবচেয়ে ভালো—কাজও থাকে, অকাজও। সবের মধ্য দিয়া কত বিচিত্র মনের সঙ্গে পরিচয় দিন দিন নিবিড় হইয়া উঠিতেছে—কাহারও কেহ নয়, অথচ কত নিবিড় আত্মীয়তা…

বেশ লাগিতেছে ; গঞ্জডিহির শেষের দিনের তিক্ততা, অকারণ কলঙ্ক

লইয়া আট বৎসর ব্যাপী জেল-জীবনের গ্লানি ধীরে ধীরে মন থেকে যাইবে। ধীরে ধীরে জীবন যেন আবার নূতন অর্থে সার্থক হইয়া উঠিতেছে।

বিকাল থেকে সন্ধ্যার খানিকটা পরে পর্যন্ত বাহিরে নদীর ধারের চাতালটির উপর বসিয়া থাকে, এটা ওর গঞ্জডিহির অভ্যাস, কাঞ্চনতলার স্মৃতিসুরভিত; দূরে কাছে বিচিত্র জীবনের চলচ্চিত্র, সামনের প্রাঙ্গণে হীরক কোম্পানির খেলা চলিতে থাকে—খদ্দরের কংগ্রেস-পতাকা হরিৎ শ্বেত গৈরিকে করে ঝলমল—শিশু বিদ্রোহীর কল্পনাবিলাসের মধ্যে মাস্টারমশাইয়ের পরিচিত রূপটি ওঠে ফুটিয়া।

এই সময় কয়েকদিন হইতে নরোত্তম চাতালের এক পাশটিতে আসিয়া বসিতেছে।

নরোত্তম সব কাজেই মাস্টারমশাইয়ের পাশে থাকিত, বিশেষ করিয়া শেষ সময়টায় ছিল, সেইজন্য টুলু আসিয়া অবধি তাহাকে খুঁজিতেছিল, কিন্তু লোকটা ছিল না এখানে। মাস্টারমশাইয়ের মৃত্যুর রহস্যটা চম্পা ব্যতীত আশ্রমে শুধু এই জানে, সেইজন্য আরও খুঁজিতেছিল টুলু। যখন কিন্তু পাওয়া গেল তাহাকে, চম্পার কাছে যেটুকু শুনিয়াছে তাহার অতিরিক্ত এক বর্ণও কিছু পাওয়া গেল না। বরং টুলুর যেন মনে হইল, সে যে এটুকুও জানে সেটাও ওর তেমন মনঃপূত হইল না। মানুষ দেখিয়া দেখিয়া দৃষ্টিটা খুব সূক্ষ্ম হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই টুলুর এ সন্দেহটা হইল। নরোত্তম শুধু প্রশ্ন করিল—কথাটা চম্পা বলিয়াছে কি না, তাহার পর টুলু—"হ্যাঁ" বলিতে কহিল, কথাটা আর কেহই জানিবে না, কর্তার বারণ। মাস্টারমশাইয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে বলিল—ওইটুকুই জানে সে, তাহাও শোনা কথা, মৃত্যুর সময় ও কাছে ছিল না; ওর কাজ ছিল মাস্টারমশাইয়ের গৃহস্থালি দেখা, তাহাই লইয়া ছিল।

লোকটার বয়স ষাটের উপর, গৌরবর্ণ, মাথার চুল একগাছি কাঁচা নাই। হাতের পায়ের শিরা-উপশিরাগুলা রক্তপুষ্ট, শরীরটা দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, বরং ভিতরকার শক্তিতে কতকটা উগ্রই বলা চলে, চোখ দুইটা উজ্জ্বল; এইটুকু ওর যেন প্রথমার্ধ, দ্বিতীয়ার্ধটা একেবারে অন্য রকম—নিতান্ত বৈষ্ণবোচিত কথাবার্তা, মুখে প্রায়

সারাক্ষণই একটা বিনীত মৃদুহাস্য লাগিয়া আছে, সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে একটা তৃণাদপি সুনীচভাব, নিজেকে মিটাইয়া দিতে পারিলেই যেন বাঁচে। ভিতরে বাহিরে এই গরমিলটা টুলুর কেমন যেন বোধ হয়, শুধু তাহাই নহে, ওর এই চাতালে আসিয়া মোটে বসাটাই লাগে অদ্ভুত। আসিয়া যে বেশ একটু আলাপ-আলোচনা করা তা নয়,—টুলু বকে, ও শুনিয়া যায়, টুলুর বক্তব্য শেষ হইলে আবার একটি ফিকড়ি তোলে, টুলু বকিয়া যায়, ও হাঁটু দুইটা চিবুকের নিচে জড়ো করিয়া শোনে। বিষয়—ওর এদিককার জীবন, এই আশ্রম কেমন লাগিতেছে টুলুর, কোন্ দিক দিয়া এর উন্নতি করা যায়? বেশ মোলায়েম করিয়া বলিবার ক্ষমতা আছে—"কর্তা গেলেন বাবাঠাকুর, কারুর সাতেও ছিলেন না, পাঁচেও ছিলেন না—এ হঠাৎ কি মতিভ্রম হ'ল—সবই গোবিন্দের ইচ্ছে—তা এই ডামাডোলের বাজার, কি ক'রে যে সামলে রাখা যায় তাঁর এই আশ্রমটুকু—সরকারের আবার দৃষ্টি না পড়ে—এই দেখুন না—সরকারের সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়া কেন বাপু?—পারবি তোরা?···কর্তারও শেষের দিকে ভুল হয়েছিল বাবাঠাকুর, এ কথা আমি বলবই···আপনি কি বলেন?··· আবার ঐ দেখুন না, হীরাটাকেও তোয়ের করছিলেন—ভালো বলতে হবে? বলুন না?"

টুলুর বেশ ভালো লাগে না, তবে বলে না তেমন কিছু, বিশেষ করিয়া যতদূর ওর কথাবার্তায় বুঝিয়াছে, মাস্টারমশাই টুলুর জীবনের পূর্ব ইতিহাস নরোত্তমকে বলেন নাই, এমনও কোন কথা শুনিল না যাহাতে মনে হয়, নিজের ওদিককার জীবনেরও কিছু আনিয়াছেন উহার গোচরে।

তবু বিরক্ত হয় মনে মনে, কেমন যেন একটা সূক্ষ্ম গোয়েন্দাগিরির ভাব। ঠিক বুঝিতে পারে না, চারিদিকেই গোলমাল, আগস্ট-বিদ্রোহের জের টানিয়া ভিতরে ভিতরে কত কি হইতেছে, এর মধ্যে এ লোকটার এমন সন্দিগ্ধ ছমছমে ভাব কেন?···মাস্টারমশাইয়ের পাশে পাশে থাকিত, কিন্তু কি নিগূঢ় উদ্দেশ্যে—কে জানে? এখন পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যুর কথাটা প্রকাশ করে নাই, তাহারই বা

কি উদ্দেশ্য কে জানে? হয়তো চরই, যথাস্থানে ঠিক পৌঁছাইয়া দিয়াছে খবরটা, এখন আর সবাইকে বেশ ভালো করিয়া জড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

এক-একদিন ওকে যেন পরিহার করিবার জন্যই টুলু হীরার সঙ্গে বিদ্রোহের খেলায় মাতিয়া যায়। তাহারই মধ্যে থেকে আড়চোখে দেখে, নরোত্তম চাতালে বসিয়া খেলা দেখিতেছে, মুখে সেই মৃদু সাত্ত্বিক হাসিটি, তাহার অন্তরালে কোথায় যেন সেই সূক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসা।

কিছু বুঝিতে পারে না। চম্পাকে সব বলিয়া দেখিয়াছে, সেও যেন বিমূঢ় হইয়া থাকে, ভীত হইয়া পড়ে। নরোত্তমকে সে মাস্টারমশাইয়ের দক্ষিণহস্ত বলিয়া জানিত, অত বিশ্বাস যে চম্পাকেও করিতেন, না তাহার প্রমাণ মাস্টার-মশাইয়ের বিপ্লবের দিকটা একমাত্র নরোত্তমই জানিত—সেই নরোত্তমই গোয়েন্দা? নূতন করিয়া হইল নাকি?—না, পূর্ব হইতেই ছিল? মাস্টারমশাইয়ের মৃত্যুর সঙ্গে তাহা হইলে তো এর একটা যোগাযোগ থাকাও বিচিত্র নয়!

নরোত্তম একজন বড় কর্মী, তাহার জন্য উদ্বিগ্নভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিল দুইজনেই, সে আসিতে কিন্তু নূতন অশান্তির সৃষ্টি হইল। টুলুর জীবনটা যেন আরও বেশি করিয়া তিক্ত হইয়া উঠিল, এবং সেই তিক্ততার বশে একদিন হঠাৎ বড় মরিয়া হইয়া উঠিয়া একটা কাণ্ড করিয়া বসিল—

কথাটা নরোত্তম যেমন ধীরে ধীরে তোলে সেই ভাবে তুলিল—"জানেন, কি সব কাণ্ড হচ্ছে চারিদিকে—ভেতরে ভেতরে?"

হীরকের সেদিন জমাট খেলা, আগস্ট-আন্দোলনেরই একটা কলি নকলগড়ের সঙ্গে জুড়িয়া একটা উগ্রতর জিনিস দাঁড় করাইয়াছে; টুলু তন্ময় হইয়া দেখিতেছিল। দক্ষিণের দিকে তমলুক অঞ্চলে কি সব হইতেছে যায় কানে কিছু কিছু, কিন্তু উত্তর দিল না প্রথমটা, তাহার পর নরোত্তম পুনরুক্তি করায় একটু বিরক্তভাবেই উত্তর করিল—"না, আমি তো বেরুই না কোথাও দেখেছ।"

নরোত্তম মোটেই অপ্রতিভ হইল না, বলিল—"হচ্ছে, এবার নাকি আগস্টের চেয়ে বড় ব্যাপার হবে।"

টুলু ফিরিয়া সোজাসুজি চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"কোথায় ?"

"আমাদের এলাকায় নয়, ভয় নেই ; এখানে সব মাটির মানুষ, তবু চারিদিকেই যদি জ্বলে আগুন, তেতে উঠতে কতক্ষণ ? সেটা তো চাই না আমরা, না, উচিত চাওয়া ? বলুন না আপনিই ?"

এই পাঁচ-সাত দিনের বিরক্তিটা টুলুর মনে যেন একসঙ্গে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, বলিল—"নরোত্তম, আমার আসল মতটা কি সেটা জানলে তোমার যদি কোন কাজ হয় তো বলতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। এত আড়ে আবডালে কথা পাড়বার কি দরকার ? তবে শোন, এই যে তাঁতের খটখটানি, চরখার ঘ্যানঘ্যানানি—এর উপর আমার এতটুকু ভক্তি নেই, আশ্রমে বাকি থাকে পড়ানোর দিকটা, সেটা মন্দ লাগত না, যদি না অষ্টপ্রহর এই কথাটা মনে পড়ত যে, আশেপাশে আর সবাই যখন দেশের ডাকে বুক দিয়ে পড়ছে ঝাঁপিয়ে—মেয়ে-পুরুষ—এদের বাপ মা ভাই বোন শান্তশিষ্ট হয়ে তাঁত বুনে গেছে আর চরখা ঘুরিয়ে গেছে। তবে আরও শোন—নিশ্চয় সে কথাগুলো তোমায় বলেন নি মাস্টারমশাই, আমি এর আগে কোথাও চাকরি করতাম না, যেমন তোমরা সব জানো,—আমি ছিলাম জেলে—আট বছর—তার একেবারে গোড়ার কারণটা এই যে, আমি আগস্ট-হাঙ্গামার জন্যেই তোয়ের হচ্ছিলাম—জীবনের সবচেয়ে বড় আপসোস আমার যে, জেলে গিয়ে পড়তে হ'ল বড় তাড়াতাড়ি, নইলে মাস্টার-মশাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে মরতে পারতাম, চরখার ঘ্যানঘ্যানানি শুনে শুনে এ রকম দগ্ধে মরতে হ'ত না। এই গেল আমার কথা। শুনেছি, তুমি মাস্টারমশাইয়ের পাশে পাশে থাকতে, কিন্তু তাঁর সমস্ত কথা তুমি জান ব'লে আমার মনে হয় না, তা হ'লে বুঝতে ও-ভাবে যে প্রাণ দিলেন—এইটেই তাঁর আসল জীবনের সঙ্গে মেলে ; এই আশ্রম খোলা—মাটির মানুষদের জন্যে, এইটেই বরং তাঁর মতিচ্ছন্ন, যেটা বুঝতে আমি সারা হয়ে যাচ্ছি আসা পর্যন্ত। এখন বুঝেছ বোধ হয়, যারা মানুষের মতন একটু সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে পুলিসের গুলি কি সঙিনের জন্যে তোয়ের হয়ে, তোমার কথায় তাদের বারণ করতে যাওয়ার পাত্র আমি নই।"

কণ্ঠস্বরটা ক্রমেই মুক্ত, উগ্র হইয়া উঠিয়াছে; উত্তেজনায় সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে; মুখটা রাঙা হয়ে উঠিয়াছে; ছেলেরা খেলা ছাড়িয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। টুলু হঠাৎ থামিয়া গিয়া হনহন করিয়া বাসার দিকে পা বাড়াইল। চম্পা আসিয়া দরজার চৌকাঠে দাঁড়াইয়া ছিল, ভীত বিস্মিত দৃষ্টি। টুলু একটা কথাও না বলিয়া চঞ্চলপদে তাহার পাশ দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

রাত্রি নিষুপ্ত, আহারাদি সারিয়া টুলু এই সময়টা পড়াশুনা করে খানিকটা। উঠানের ওদিককার ঘরে চম্পা এই সময়টা একটু আধটু শখ বা ফুরসতের কাজ যা ইচ্ছা হয় করে, নিয়মিত কাজের যদি কিছু বাকি থাকে শেষ করিয়া লয়। একজন আধা-বুড়ি আগুরি স্ত্রীলোক এইখানেই শোয় রাত্রে, খায়ও, সেও থাকে জাগিয়া; কাজ থাকিলে সহায়তা করে। পড়া শেষ হইলে টুলু যায় শয়ন করিতে। আশ্রমের চালাটার পাশেই একটা বেশ বড় পাশ-ঘর আছে—গুদাম, তা ভিন্ন টাকাকড়ি যা কিছু তাও সেই ঘরে থাকে; আরও জন চারেকের সঙ্গে টুলু সেইখানে শোয়।

টুলু পড়িতেছিল, চম্পা একটু যেন বিমর্ষ মুখে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"নরোত্তম দেখা করতে চায় আপনার সঙ্গে।"

টুলু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল—"হঠাৎ এত রাত্তিরে?"

"কি জানি! আপনার সঙ্গেই দরকার।"

"একলা?"

"তাই তো মনে হচ্ছে, অন্তত সঙ্গে তো কেউ নেই।"

টুলু সেইভাবেই একটু চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—"ডেকে দাও।"

নরোত্তম প্রবেশ করিয়া একবার পিছনে চাহিল, চম্পা চৌকাঠের কাছে আচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল—"মা-মণি, তুমি ও-ঘরে যাও একটু।"—মাস্টারমশাইয়ের কন্যা হিসাবে ওই ভাবেই ওকে ডাকে সকলে এখানে। টুলুও ঘাড় নাড়িয়া যাইতে বলিলে চম্পা যেন নিরুপায় হইয়া, বেশ খানিকটা ভয় সঙ্গে করিয়াই চলিয়া গেল।

নরোত্তম ফতুয়ার পকেটে হাত দিয়া একটা কাগজ বাহির করিতে করিতে বলিল—"একটা চিঠি আছে আপনার।"

বুড়া হইলেও নার্ভ খুব শক্ত, তবু হাতটা একটু একটু কাঁপিতেছে। খাম ছিঁড়িয়া টুলু চিঠিটা পড়িতে লাগিল—

"কল্যাণবরেষু,

ব্রত উদ্‌যাপন করতে এসেছি, সেই পুণ্যক্ষত্র থেকেই এই চিঠি দিচ্ছি। আমাদের মস্তবড় বিজয়ের দিন, আশা হচ্ছে, একটার পর একটা বিজয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা সত্যই এবার পারব আমাদের ব্রত উদ্‌যাপন করতে। একটা বিজয় পূর্ণ—কংগ্রেসকে আমাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছি—সেটা রূপ নিয়েছে 'কুইট ইণ্ডিয়া'-য়। সপ্তাক্ষর মহামন্ত্র, কংগ্রেস জানে, এ অহিংস মন্ত্র নয়, আবেদন নিবেদন ক'রে তো তস্করকে বলা চলবে না—তুমি এবার নিজের বাড়ি যাও; সে আদেশের পেছনে থাকে শক্তির দৃঢ়তা, উগ্র শাস্তির সম্ভাবনা। এই আমাদের প্রথম জয়; কংগ্রেসকে নবজীবন দিলাম, তাকে কঠিন বাস্তবে সচেতন ক'রে তুললাম।

এর পর আসল অভিযান। ১৮৫৭ হবে নিষ্প্রভ, আমার প্রায়-বার্ধক্যের শীর্ণ শিরার মধ্যেও যে কী আগুনের নাচন, টুলু, তোমায় কি ক'রে বোঝাই? ন'উই আগস্ট!—যে শক্তি এত বিপদের মধ্যে আমায় বাঁচিয়ে এসেছেন তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, আমি ন'উই আগস্ট যেন দেখতে পাই। তুমি জান, প্রার্থনাকে আমি জীবনে আমল দিই নি, আমার বিশ্বাস—যুগযুগান্তরের বহু প্রার্থনার ফলেই তো তিনি আমায় এই আত্মশক্তি দিয়েছেন, এর পরেও আবার প্রার্থনা কেন? তবুও, কেন বুঝতে পারছি না, এই প্রার্থনাটুকু—এই সামান্য আয়ু ভিক্ষা করছে আজ আমার অন্তরাত্মা; জীবনের প্রথম এবং শেষ প্রার্থনা; আশা অত্যুগ্র হ'লে মনকে বোধ হয় দুর্বল করে একটু।

ন'উই আগস্টের পরে কি আছে জানি না, তবে আমি যে নেই—সেইটে ধ'রে নিয়েই এই চিঠি লিখে রাখা আজ; আমি থাকলে তো চিঠির দরকার হ'ত না,

সশরীরেই তোমার মুক্তির দিনে তোমায় অভিনন্দিত ক'রে নিয়ে সব কথা বলতাম।

এবার আশ্রমের কথায় আসা যাক। আশ্রমটা তোমায় বিস্মিত করবে, তুমি ফিরবে ন'উই আগস্টের অনেক পরে, এসে শুনবে শুধু মেদিনীপুর কেন, শুধু বাংলা কেন, সারা ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যখন বিক্ষুব্ধ, মরণ তুচ্ছ ক'রে নূতনের জন্যে পথ তোয়ের করতে মেতে উঠেছে—ভেঙে ছিঁড়ে উপড়ে পুড়িয়ে, যারা বাধা হয়ে দাঁড়াল তাদের নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে ফেলবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে, তখন এই আশ্রম ডাইনে বাঁয়ে না চেয়ে শান্ত শিষ্ট হয়ে ঘুরিয়ে গেছে চরখা, বুনে গেছে তাঁত; তোমার মাস্টারমশাইয়ের আশ্রম, শান্তিমন্ত্রের আর তার চেয়ে বড় অবিশ্বাসী তোমার চোখে বোধ হয় পড়ে নি। কারণ আছে, —আজ, অর্থাৎ যে দিন তোমার হাতে এই চিঠিটা পড়বে, সেই দিন তোমায় সেই কারণটা বলতে বাধা থাকবে না। গীতার কথাই বলি—কর্ম জিনিসটা অর্থাৎ যুদ্ধটা সুনিশ্চিত, কেন-না, সেটা আমাদের হাতে, কিন্তু বিজয় তো সুনিশ্চিত নয়। আগস্ট-সংগ্রামের তোড়জোড় ভালো, কিন্তু যা লক্ষ্য ক'রে সে সংগ্রাম তা পূর্ণরূপে তো নাও পেতে পারি। তখন দরকার পড়বে এর চেয়েও একটা বড় কিছু, শান্তি-আশ্রম রইল তার জন্যে। যে সিংহটাকে সবচেয়ে বড়ো লাফ দিতে হবে, তাকে আগে থাবা গুটিয়ে, ঘাড়-মুখ গুঁজে শান্তশিষ্টটি হয়ে মাটি কামড়ে বসতে হয়, এই পশ্চারটার মধ্যে থাকে ভাঁওতা—শিকারের চোখে ধুলো দেওয়া, সেই সঙ্গে শক্তি সঞ্চয়। শান্তি-আশ্রম এই থাবা-গুটিয়ে-বসা সিংহ।

যদি সম্পূর্ণভাবে সফল আমরা নাও হতে পারি তো এটা ঠিক যে আগস্ট আমাদের কাজ অনেক এগিয়ে দেবেই, শত্রু সাময়িকভাবে জয়ী হ'লেও আহত হবে খুব বেশি, যাতে সে প্রায় অকর্মণ্য হয়ে পড়বে। এই সময় তাকে বেশ টাটকা-টাটকি চরম আঘাত দেওয়ার জন্যে খানিকটা শক্তি বাঁচিয়ে রাখা দরকার, শান্তি-আশ্রম সেই অনাদৃত শক্তি। যুদ্ধের নিয়মই এই। তোমায় বলি, অনেক জায়গাতেই আমরা এইরকম নিরীহ আশ্রম রেখেছি গ'ড়ে, ওরা স্তম্ভিত হবে, এত

বিক্ষোভের মধ্যেও এত শান্ত রূপ দেখে ওদের চোখ যাবে জুড়িয়ে, তারপর একদিন হঠাৎ আরও ঢের বেশি হবে স্তম্ভিত আসল রূপটা দেখে,—তখন কিন্তু আর ওদের উপায় থাকবে না।

তোমায় সেই দিনটির ভার দিয়ে যাচ্ছি। এতেও তুমি আশ্চর্য হবে, তোমায় একদিন সেবা নিয়ে থাকতে বলেছিলাম। আট বছর আগের শেষ সাক্ষাতে শেষ কথা তোমায় এই বলেছিলাম যে, তোমার মনের গঠনটা বিদ্রোহের নয়; পিস্তলটা তোমার হাতে তুলে দিতে হাত কেঁপেছিল আমার, আজ সেই আমি তোমায় এতবড় ভারটা দিচ্ছি কি ক'রে, কোন্ সাহসে আর কোন্ বিশ্বাসে? এ চিঠিটাও বা তুমি দেরি ক'রে পেলে কেন? এই সবের রহস্য তুমি নরোত্তমকে প্রশ্ন ক'রে জানতে পাবে। হ্যাঁ, প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখি—নরোত্তম নিজেই একটা মস্তবড় রহস্য, টের পাবে তুমি।

পিস্তলটা নিশ্চয় নেই, আমার রাইফেলটা দিয়ে গেলাম—অর্থাৎ দীক্ষা অটুট রইল, বরং তার গতি হ'ল আরও দীর্ঘ।"

চিঠিটা এই পর্যন্ত তিনখানি পাতা লইয়াছে, কালো কালিতে বেশ ধরিয়া গুছাইয়া লেখা; পাতা উল্টাইতেই কিন্তু টুলুর ভ্রূ দুইটি হঠাৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল,—নিতান্ত অবিন্যস্ত, গোটা গোটা আঁকাবাঁকা অক্ষরে আর মাত্র পঙ্‌ক্তি দুয়েক লেখা, তারপরেই মাস্টারমশাইয়ের দস্তখৎ—সবটা লাল কালিতে—কালির ছোপছাপ কাগজের আরও কয়েক জায়গায় লাগিয়া আছে। একটু বাধিয়া গিয়া পড়িল—"আমি চললাম। এটুকু একেবারে পীঠস্থান থেকে লিখছি। এই তোমার রক্তদীক্ষা রইল। আশীর্বাদ। মাস্টারমশাই।"

চিঠি শেষ করিয়া টুলু অবোধ দৃষ্টিতে নরোত্তমের মুখের পানে চাহিয়া রহিল, জিভ যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত, কোন কথা বাহির হইতেছে না মুখে। নরোত্তমই আগে কথা কহিল—"কিছু জিগ্যেস করবেন?"

"জিগ্যেস?...অ্যাঁ! হ্যাঁ, অনেক কথাই...শেষের এই কথা কটা..."

"রক্ত দিয়েই লেখা, তাঁর নিজের রক্ত, বাঁ পাশের নিচে দিয়ে গুলি বেরিয়ে গেছ্‌ল।···একটা পাতলা কাঠি কুড়িয়ে সেই রক্তে ডুবিয়ে ডুবিয়ে শেষ অবস্থায় লিখে যান ; চিঠিটা তাঁর পকেটেই থাকত। তারপরেই যান মারা।"

"এতদিন চিঠিটা আমায় দাও নি কেন ?"

"হুকুম ছিল আগে বুঝতে আপনার মনের ভাবটা—জেল থেকে এলে।"

"তাই এ রকম ভাবে আমায় পরীক্ষা করছিলে এতদিন ধ'রে ?"

নরোত্তম চুপ করিয়া রহিল।

"যদি দেখতে এই শান্তির মধ্যেই কাজ করতে ভালো লাগছে আমার, হাঙ্গাম চাই এড়াতে ?"

নরোত্তম এবারেও চুপ করিয়াই রহিল, মুখে খুব অল্প যেন একটু হাসি ফুটিল। টুলুর প্রশ্নটার পুনরুক্তিতে বলিল—"এর উত্তরটা আপনার ভাল লাগবে না।"

"তবু বলো, শুনি।"

"তা হ'লে আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে হ'ত—কোনও রকম ছুতো ক'রে।"

"তার মানে, তাড়িয়ে দিতে ?"

"তাই-ই।"

"মাস্টারমশাইয়ের স্পষ্ট হুকুম ছিল ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

এবার টুলু করিল চুপ ; ধীরে ধীরে চক্ষে কি একটা অপূর্ব দীপ্তি উঠিল ফুটিয়া ; রক্ত পঙ্‌ক্তি দুইটা নিজের ললাটে চাপিয়া বসিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর যেন জাগিয়া উঠিয়া বলিল—"ও ! নরোত্তম ?···বেশ, তুমি যাও এখন, রাত হয়েছে।···হ্যাঁ, একটা কথা, আর কেউ জানে না এই চিঠির কথা, না ?"

"না।"

"চম্পাও না ?"

"না, মা-মণি শুধু মারা যাওয়ার কথাটাই জানে।"

"চম্পাকে বলা চলবে ?"

"আজ থেকে একেবারে আপনার আশ্রম। যেমন ভাল বুঝবেন।"

টুলু একটু নত-দৃষ্টি থাকিয়া বলিল—"বেশ, চম্পাকে ডেকে দিয়ে যাও।"

৬

চিঠিটা শুনিয়া চম্পা মুখের পানে চাহিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

একটু পরে টুলু প্রশ্ন করিল—"কিছু বলছ না যে চম্পা ?"

চম্পা হাসি দিয়া মনের কোন একটা অন্য অনুভূতিকে চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"নতুন কি আর বলব ?"

"নতুন কিছু নেই চিঠিটায় ?"

"আছে অনেকখানি, কিন্তু আমার বলবার মতন নতুন কি আছে ?"

"তা হ'লে আরও স্পষ্ট ক'রে জিগ্যেস করতে হ'ল আমায়,—এই নতুন অবস্থার মধ্যে, মানে, আমায় মাস্টারমশাই যে নতুন কাজ দিয়ে গেলেন, তার মধ্যে তোমার আর থাকা চলবে ?…তাই তোমায় ডেকে পাঠালাম এখনই।"

"আমার আলাদা জায়গা আর কি আছে ?…কি রেখেছি ?"

"সে আলাদা কথা, আলাদা জায়গায় তোমার ব্যবস্থা স্বচ্ছন্দেই ক'রে দিতে পারা যায়। তা ভিন্ন তুমি আর একলা নও, হীরক রয়েছে—এই বিপদের মধ্যে ঐ শিশুকে ধ'রে রাখা…"

যেন জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে—এই ধরনের একটা তর্কে হারিয়া গিয়া চম্পা ব্যাকুলভাবে মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ওর মুখটা একটু দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল—"ওকে তো বরং সরিয়ে রাখা যায়—শুধু ওকে…আর দিন কতক পরে তো করতেই হ'ত ব্যবস্থা—ওর পড়াশোনার জন্যে…"

সাফল্যের উত্তেজনায় স্বরটা একটু কাঁপিয়া গেল শেষের দিকে। টুলু প্রশ্ন বলিল—"তটিনীর কথা ভাবছ ?"

• "হ্যাঁ। ভগবানই জুটিয়ে দিয়েছেন—ঠিক সময়টিতে। ভালো জায়গায় থাকে—নিজে শিক্ষিতা—আর অমন চমৎকার মানুষ—তায় নির্ঝঞ্ঝাট, তার ওপরে আবার দেখুন···"

বিশেষণ একত্র করিতে যেন মাতিয়া উঠিয়াছে, টুলু চোখ তুলিয়া একটু হাসিতে অপ্রতিভভাবে চুপ করিয়া গেল, সপ্রতিভ ভাবটা বজায় রাখিবার জন্য বলিল—"মিছে বলছি? বলুন?"

টুলু বলিল—"একটাও মিছে নয়। কিন্তু তবুও তো আসল সমস্যাটা মেটে না। কথা হচ্ছে তুমি থাকবে কি ক'রে এই বিপদের মধ্যে? বুঝলাম হীরকের ব্যবস্থা হতে পারে আলাদা, তটিনীর কাছে, না হয় অন্যত্রও হ'ত।

চম্পার মুখটা হঠাৎ দীন ভিখারিণীর মতোই আতুর হইয়া উঠিল, এমন অসহায় যেন জীবনে কখনও বোধ করে নাই নিজেকে, বলিল—"আমায় আর ঝেড়ে ফেলে দেবেন না পা থেকে।"

টুলুর মুখটাও ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল; অনেক রকমেই দেখিল চম্পাকে, বোঝে তো খানিকটা। তাহার পর আস্তে আস্তে তাহার মুখটা কঠিন হইয়া উঠিল,—রূঢ় নয়; একটা ফাঁসির হুকুম দিবার সময় বিচারকের মুখ যেমন হইয়া ওঠে—দরদ অথচ এদিকে কর্তব্য। চিঠিটা চম্পার দৃষ্টির নিচে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"চম্পা, চিঠিটা শুধু পড়বার নয়, দেখবারও, এই শেষের লাইন কটা মাস্টারমশাইয়ের বুকের রক্ত দিয়ে লেখা—আমার ভাষার চটক নয় এ, সত্যিই রক্ত—এই দেখো—কি ক'রে থাকবে তুমি এর মধ্যে?—কতদূর পর্যন্ত যে কি হতে পারে···"

কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া চম্পার দৃষ্টি রক্তমসী অক্ষরগুলার উপর নিষ্পলক ভাবে নিবদ্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর নিতান্তই নিরুপায়ভাবে টুলুর মুখের উপর চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল—"তা হ'লে?"

টুলু কোন উত্তর দিবার পূর্বেই কিন্তু তাহার মুখটা আবার হঠাৎ দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল—"হয়েছে। মাস্টারমশাই আমাকেও তো এই কাজ দিয়ে গেছেন···"

"কি ক'রে ?"

"বাঃ, তা না হ'লে আমায় এখানে নিয়ে এলেন কেন ? তিনি তো নিজের অভিসন্ধি সবই জানতেন। অল্পদিন নয়—আট মাস ছিলাম সঙ্গে।"

টুলু এবারে চুপ করিয়া রহিল। চিন্তায় আবর্ত উঠিয়াছে, ওর মনটাকে নিজের যুক্তির দিকেই চালিত করিবার জন্য চম্পা বলিয়া চলিল—"ঠিক আপনি মিলিয়ে দেখুন—না হ'লে কেন নিয়ে আসবেন এখানে আমায় ? আমায় সরিয়ে রাখবার তো অনেক জায়গা ছিল—চারিদিকে তাঁর গতিবিধি, চারিদিকে তাঁর প্রভাব খাতির…"

নজির দেখাইয়া চলিয়াছে। আবার গলার স্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। টুলু একসময় গভীর অন্যমনস্কতা থেকে জাগিয়া উঠিয়া বলিল—"তুমি ভেবে বলছ না চম্পা, দেখছ—এ একেবারে রক্ত দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার, তুমি মেয়েছেলে হয়ে…"

"মেয়েছেলে হয়ে রক্ত নেওয়াই না হয় বারণ, দিতে কি বাধা ?"

উত্তরটায় থতমত খাইয়া গেল টুলু, খানিকক্ষণ চম্পার মুখ হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না ; তারপর ধীরে ধীরে বলিল—"আচ্ছা, এখন তুমি যাও, পরে ভেবে দেখব—দুজনে মিলেই।"

সন্ধ্যার সময় অল্প অল্প মেঘের সূত্রপাত হয়। কাজের মধ্যে চম্পা আর আকাশের দিকে লক্ষ্য করে নাই। টুলুর ঘর থেকে উঠানে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা মন্থর গুরু-গুরুধ্বনি আকাশের গা বাহিয়া দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে গড়াইয়া গেল। চম্পা চোখ তুলিয়া দেখিল, সমস্ত আকাশটাই পুরু মেঘে ছাইয়া গেছে। একটা দমকা হাওয়া উঠিয়া গাছপালাগুলায় একটা আর্তমর্মর উচ্চকিত করিয়া ঘরের দুয়ার-জানালাগুলাতে কড়া ঝাঁকানি দিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

পা চালাইয়া গিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই হীরক বলিয়া উঠিল—"মা, ভয় করছে।"

জাগিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে।

"এই যে আমি রয়েছি বাবা, ভয় কি ?"

জানালাগুলা বন্ধ করিয়া, দুয়ার দিয়া, একেবারে বিছানায় গিয়া উঠিল। একটি স্থচীশিল্প লইয়া বসিয়া ছিল বলিয়া আহার করে নাই এখনও, ভাতটা যেমন ঢাকা তেমনি ঢাকাই রহিল।

বয়স হিসাবে সাহসী ছেলে হীরক, কিন্তু মা কাছে থাকিলে ভয়ের কিছুর সামনে বড় দুর্বল হইয়া পড়ে, কোলের মধ্যে গুটাইয়া-সুটাইয়া চম্পাকে অধিকার করিয়া বসিল একেবারে। খানিকক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িল।

আবার থাকিয়া থাকিয়া ঐরকম গোটাকতক দমকা হাওয়া উঠিল, তাহার পর আওয়াজটা হইয়া উঠিল একটানা; প্রথমে মন্থর, ক্রমেই ধীরে ধীরে বাড়িয়া চলিল। এক সময়ে বৃষ্টি নামিল; একটা রীতিমতো দুর্যোগ আরম্ভ হইয়া গেল।

সমস্ত রাত চম্পার চোখে এক রতি ঘুম নাই। বাহিরের দুর্যোগ হয়তো এক-একবার স্তিমিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার অন্তরের দুর্যোগের এতটুকুর জন্য বিরাম নাই। অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা কাটাইয়া মনে হইয়াছিল যেন সাগরদহে শেষ পর্যন্ত বাঁধা গেল একটু নীড়; তা আজকের রাতে শত সহস্র নীড়ের মতই আবার সেটুকু ছিন্নভিন্ন হইতে চলিল। কোন্ দিকটা বাঁচায় সে ? টুলুকে রাখিতে হইলে হীরককে ছাড়িতে হয়। আট বৎসর আগে গঞ্জডিহিতে এই রকম সমস্যার সম্মুখীন হইলে পথ বাছিয়া লওয়া সহজ ছিল চম্পার, হীরকের মায়া টুলু থেকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিত না তাহাকে; কিন্তু আজ আর তত সহজ নয়। এই আট বৎসরের প্রতি মুহূর্তে নিজের বুকের উত্তাপ দিয়া মানুষ করিয়াছে মায়ের মত করিয়া—সম্ভব হয়তো মায়ের চেয়েও বেশি করিয়া—আজ তাহার সঙ্গে বিচ্ছেদের কথায় মায়ের মতই বত্রিশ নাড়িতে টান ধরে।···চম্পা সুপ্ত হীরককে বুকে চাপিয়া চাপিয়া ধরে, নিজের মনেই বিড়-বিড় করিয়া বলিয়া

ওঠে—"কি ক'রে বললাম তোকে আলাদা ক'রে দেব? কি ক'রে পারলাম বলতে? অত প্রশংসার কথা কোথা থেকে এসে জুটল আমার পোড়া ঠোঁটে? ...মা নয় রে হীরা, ডাইনি—সম্ভব হ'ল কি ক'রে? যদি দেনই তোকে আলাদা ক'রে..."

এর পাশাপাশি মনে হয় টুলুর কথা, এক-এক সময় হীরকের চিন্তার সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া,—টুলু নাই, টুলু বিপদের মধ্যে অথচ চম্পা নাই পাশে—সে আবার কি অদ্ভুত, কি অসম্ভব, অচিন্তনীয় একটা অবস্থা! যে শূন্যতাটা জাগে মনে, পৃথিবীর কোন কিছু দিয়াই তো সেটাকে ভরাট করিয়া দিতে পারে না চম্পা; ওই হীরাকেই—টুলুর সন্তানকেই বুকের মধ্যে চাপিয়া দারুণ আতঙ্কে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। চিন্তাটাকে পরিণামের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে সাহস হয় না।

বাহিরে অতন্দ্র রজনীর প্রহরগুলাকে দীর্ঘায়িত করিয়া পঞ্চভূতের রণতাণ্ডব চলিয়াছে ওদিকে, অভিশপ্ত পৃথিবীকে মুছিয়া ফেলিবে নাকি?

ভোরের দিকে বাতাসটা নরম হইল, বৃষ্টিরও বেগটা কমিল; ক্লান্তির মধ্যে এই বিরামটুকুতে চম্পা কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, জাগিল একেবারে প্রলয়ের পূর্ণ রূপের মধ্যে। মাথার উপর চালের অর্ধেকটা নাই, তাহার জায়গায় একটা জামের ডাল ছেঁচা বেড়ার দেয়াল চাপিয়া ঘরের অর্ধেকটা পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে; ঝড়ের তোড়ে তোড়ে ক্রমেই আরও নামিতেছে—এই বুঝি পিষিয়া মারিল! এই সঙ্গে গর্জন—ঝড়, ডাল ভাঙিয়া পড়িতেছে, মানুষের আর্তনাদ · একটু বিমূঢ় ভাবে বসিয়া থাকিয়াই চম্পার রাত্রির কথা মনে পড়িয়া গেল—একটা দুর্যোগ উঠিয়াছিল। প্রথমেই খেয়াল হইল—হীরক নাই কোলের কাছে। ঘরটা দুলিতেছে, চম্পা আলুথালু বেশে এক রকম লাফাইয়াই দুয়ারের কাছে আসিতেই দেখে উঠানের ও-প্রান্ত থেকে টুলু, নরোত্তম, আরও তিন-চার জন ছুটিয়া আসিতেছে—ঝড়ের গর্জনের উপর আওয়াজ তুলিবার চেষ্টা করিতেছে—"বেরিয়ে এসো, শীগগির বেরিয়ে এসো ঘর ছেড়ে—বাড়ি ছেড়ে স্কুলে..." নরোত্তম একটা

হুকুমের টোনে সঙ্গীদের বলিয়া উঠিল—"তোমরা বাইরে যাও—মানা করছি তখন থেকে।···সঙ্গে সঙ্গে টুলুকে বাঁ হাতের একটা সাপটে পিছন দিকে ঠেলিয়া কয়েকটা লাফে উঠান পার হইয়া চম্পার ডান হাতটা বজ্র আঁটুনিতে ধরিয়া ফেলিল এবং মত্ত শক্তিতে তাহাকে বিরুদ্ধ ঝড়ের প্রচণ্ড চাপের মধ্য দিয়া টানিতে টানিতে একেবারে আপিস-ঘরে আনিয়া তুলিল। টুলু, আর বাকি সবাইও জড়াজড়ি করিয়া সবার শক্তি একত্র করিয়া কোনরকমে আসিয়া জড়ো হইল। চম্পার প্রথম কথা হইল—"হীরা—হীরা কোথায়—আমার কোলের কাছে ছিল যে···" আসিতে আসিতেও এই প্রশ্ন মুখে লাগিয়া ছিল, যেন পাগলের মত হইয়া গেছে। হীরক অভ্যাসমত সকালে উঠিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল, ঝড়ের তখন বিরতি; দরজার পাশেই এক জায়গায় হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ভিড়ের মধ্য দিয়া আসিয়া চম্পাকে জড়াইয়া ধরিল।

সমস্ত তল্লাটটায় এই একটি মাত্র কোঠাঘর, আর এই একটি মাত্রই ঘর যাহা দাঁড়াইয়া আছে এখনও। লোক একেবারে চাপ বাঁধিয়া উঠিয়াছে; আরও আসিতেছে, পড়িয়া উঠিয়া গড়াইয়া; জায়গা না পাইয়া দেয়ালের আড়ালে আশ্রয় লইতেছে, ঝড় বৃষ্টির ঝঙ্কার ছাড়াইয়া উঠিতেছে সবার আর্ত কোলাহল। ঘরটার সংলগ্ন আশ্রমের টানা চালাটা হুমড়াইয়া ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছে, ঝড়ের একটা তোড়ে চালার একটা কোণ মুচড়াইয়া ছিঁড়িয়া যেন লুফিতে লুফিতে দূরে নদীর ঢালুতে আছড়াইয়া ফেলিল। বড় ডালপালা লইয়াও এই রকম লোফা-লুফির খেলা—একটার ঘাড়ে একটা আসিয়া পড়িতেছে, গাছগুলা পড়িতেছে উপড়াইয়া, উৎকট নিনাদ, তীরলগ্ন একটা পুরানো অশ্বত্থ উত্তাল নদীগর্ভে একেবারে যেন ডিবাজি খাইয়া বসিল, শিকড়গুলা শূন্যে উঠিল লাফাইয়া, সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র বৃষ্টির ছাটে ধুইয়া গিয়া যেন কাহার বিকশিতদন্ত অট্টহাসের মত নদীগর্ভে রহিল জাগিয়া, কয়েকটাই গরু ছাগল হাওয়ার মুখে ছুটিতে ছুটিতে চোখের সামনে চাপা পড়িল।··দক্ষিণ থেকে উত্তরে একটানা একটা ধ্বংসের স্রোত; দেখিতে দেখিতে সমস্ত জায়গাটা পরিষ্কার হইয়া গিয়া সেই মসীকৃষ্ণ আকাশের

নিচেও একটা আলো ফুটিয়া উঠিল—স্নিগ্ধ শ্যামলিমার জায়গায় একটা রুগ্ন নীলাভ বিকৃত আলো। এমনই একটা অভিনব ব্যাপার যে এক সময় সবাই আর্তনাদ ভুলিয়া, পরিণাম ভুলিয়া, স্তব্ধভাবে শুধু সামনে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, প্রেক্ষাগৃহের মধ্য হইতে মুগ্ধচেতন হইয়া যেন একটা বিরাট ধ্বংস অভিনয় নিরীক্ষণ করিতেছে, ভীষণতার সামনে আর সব চেতনাই যেন নিষ্ক্রিয় হইয়া গেছে।

বিকাল পর্যন্ত প্রায় একই ভাবে থাকিয়া ঝঞ্ঝার বেগ ধীরে ধীরে শমিত হইয়া আসিল। ঘর ছাড়িয়া সকলে নামিয়া আসিল, হিসাবের পালা আরম্ভ হইল, সেই সঙ্গে আর্তনাদটা আবার ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিল,—কাছে দূরে—আরও দূরে—অন্য একটা ঝড়, সবহারাদের কণ্ঠ চিরিয়া শান্ত আকাশ আবার মথিত করিয়া তুলিতেছে।

৭

বাংলার যত দুর্বিপাক, যত সমস্যা এক এক করিয়া মেদিনীপুরে জমা হইতেছিল। যুদ্ধের সময় ধীরে ধীরে জেলাটা দেশী বিলাতী সৈনিকে যাইতেছে ভরিয়া, গ্রাম উজাড় করিয়া ছাউনি পড়িতেছে, হাজার হাজার বিঘা শস্যক্ষেত্র সমতল করিয়া তৈয়ার হইতেছে বিমানঘাঁটি, পাকাপোক্ত, আবার এমনি শুধু ল্যাণ্ডিং। জাপান যুদ্ধে নামিল, জাপান-ভীতির পর জেলার দক্ষিণ-উপকূলটা প্রায় আগাগোড়াই একটানা একটা সামরিক বন্ধনীতে পরিণত হইল। ফলনের দিক দিয়া দুর্বৎসর চলিয়াছে; এমনই উনিশ' একচল্লিশ একটা ঘাটতি বছর হইয়া পড়িবে বলিয়া আশঙ্কা ছিল। তাহার উপর সমর-রাক্ষস, যেটুকু হইল সেটুকুও ধীরে ধীরে নিজের উদরসাৎ করিয়া ফেলিতে লাগিল। সমস্ত জেলার উপর দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া আসিয়া পড়িল। সৈনিকদের উদরের চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর তাহাদের আবদার, ছোট বড় অত্যাচারে গৃহস্থেরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। মেদিনীপুরের

গৃহস্থের•একটা বৈশিষ্ট্য আছে, একটা ট্র্যাডিশন্—অতিষ্ঠ হইলে তাহারাও অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। ছোট ছোট সংঘর্ষ বাধিতে লাগিল। এর পর আসিল গবর্নমেণ্টের ডিনায়েল পলিসি বা বঞ্চন-নীতি, কুখ্যাত স্কর্চ্ড্ আর্থ বা পোড়া-মাটি নীতির সহোদর। জাপানীরা নামিলে যাহাতে যানবাহন বা রসদ সংগ্রহের সুযোগ না পায়, সেইজন্য দক্ষিণ-মেদিনীপুরের যত নৌকা, মোটর, এমন কি সাইকেল পর্যন্ত ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট রেখার উত্তরে—পঞ্চাশ যাট মাইল দূরে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ জারি হইল। নৌকা, মোটর বাস, সব-কিছুরই জন্য এক হুকুম—এই সমদর্শিতার মধ্যে বেশ একটা রসিকতা ছিল, মোটরের সঙ্গে নৌকার পাল্লা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল না ; সুতরাং অধিকাংশ নৌকাই ভাঙিয়া বা জ্বালাইয়া দিয়া মুশকিল-আসান করা হইল।·· ন্যূনাধিক ছয় শত বৎসর পূর্বে দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ তোগলক এই রকম কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দিল্লীর অধিবাসীদের নাকি দেবগিরিতে গিয়া আস্তানা গাড়িতে বলে। শোনা যায়, একটি অন্ধ আর একটি চলচ্ছক্তিহীন বৃদ্ধ আদেশ পালনে অসমর্থ হওয়ায় তাহাদের পায়ে দড়ি বাঁধিয়া যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।···ছয় শত বৎসরের ব্যবধানে এই দুইটি রাজকীয় ফারমানের মধ্যে চমৎকার একটি সাদৃশ্য নাই কি ?···মহম্মদের ফারমান লইয়া ইংরাজ ঐতিহাসিক আজও বিদ্রূপে মাতিয়া ওঠে !

বঞ্চন-নীতিতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শত সহস্রের রুজি নষ্ট হইল। অশান্তি বাড়িল।

পাশে পাশে চলিল চাল রপ্তানি। লোকেরা আপত্তি করিল, প্রথমে কল-ওয়ালাদের নিকট, আড়ৎদারদের নিকট, তাহার পর জেলার মালিক পর্যন্ত। কোনও ফল হইল না। শত্রুনিরোধ করিবার নামে চারিদিকেই মৃত্যুর রাজপথ গড়িয়া ওঠে দেখিয়া জনতা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। আপত্তি বিরোধিতায় এবং বিরোধিতা রীতিমত সংঘর্ষে গিয়া দাঁড়াইল—কলের মালিক আর আড়ৎদারদের সঙ্গে। গবর্নমেণ্ট ইহাদের পক্ষ লইয়া দাঁড়াইল। দিনীপুরে জনতার উপরে গুলি

চলিল। দেশের ছেলের রক্তে মেদিনীপুরের মাটি রঞ্জিত হইল। রক্তের বিনিময়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিতিল জনতাই ; কলওয়ালারা মোটা জরিমানা দিয়া রেহাই পাইল। ব্যাপারটা হয়তো এমন বিরাট কিছু নয় ; তবে গুরুত্বপূর্ণ,—একটা শক্তি পরীক্ষা হইয়া গেল।

এসব মেদিনীপুরের স্থানীয় ব্যাপার ; স্থানীয় সমস্যা লইয়া। এর পাশে পাশে চলিতেছিল একটা বিরাটতর আলোড়ন—সর্বভারতীয় বিক্ষোভ—'কুইট ইণ্ডিয়া'-মন্ত্রকে সফল করিতে হইবে। দক্ষিণ-মেদিনীপুরের উপর অসম্ভব রকম সামরিক চাপ ; সেইজন্য একতালে উঠিতে পারে নাই। আগস্টটা এক রকম বাদ গেছে বলিলেই চলে, অন্তত তাহাতে মেদিনীপুরের নিজস্ব শিলমোহর ছিল না। পরে দিনীপুরের রক্ত দিয়া কেনা বিজয়টা সবার মধ্যে একটা আত্মচেতনা জাগাইয়া দিল, গণশক্তি দিন দিনই দুর্বার হইয়া উঠিতে লাগিল। নব্য-ভারতের প্রথম শহিদ ক্ষুদিরামের জন্মভূমি আবার নিজের ইতিহাস নূতন করিয়া গড়িবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। উনত্রিশে সেপ্টেম্বর বিভিন্ন স্থানে জনতা একজোট হইয়া থানা, রেজেস্টারি অফিস, ডাকঘর, ইউনিয়ন-বোর্ড অফিস, পঞ্চায়েৎ অফিস প্রভৃতি যেখানেই গবর্নমেণ্টের কেন্দ্র বা গবর্নমেণ্টের সংস্রব সমস্ত আক্রমণ করিল ; রাস্তা কাটিয়া, পুল ভাঙিয়া সাহায্যের সম্ভাবনা নষ্ট করিল, টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের তার ছিঁড়িয়া তছনছ করিয়া দিল। সংঘর্ষের কেন্দ্র তমলুকে যাহা হইল তাহাকে সুপরিচালিত সমরের নিচে কোন আখ্যা দেওয়া যায় না। শুধু পুরুষ নয়, স্ত্রীলোকও ছিল পাশে। অনেকে মরিল, জখম হইল আরও অনেকে ; সত্তর বৎসরের নারী বিদ্রোহিনী দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়বদ্ধ জাতীয়-পতাকা ধারণ করিয়া সরকারী সৈনিকের গুলিতে প্রাণ দিল।

দমননীতি আরম্ভ হইল ; নির্মম, অমোঘ, অব্যর্থ ; দোষী-নির্দোষেতে জেল উঠিল ভরিয়া, মামুলি জেলে কুলাইল না, ক্যাম্প জেলে সমস্ত এলাকাটা গেল ছাইয়া, দেশী বিলাতী সৈন্য গিয়া গ্রামে হানা দিল, অগ্নিকাণ্ড, লুঠ, নারীধর্ষণ—চারিদিকে শয়তানের উৎসব পড়িয়া গেল।

এর গায়ে গায়েই আসিল ১৬ই অক্টোবরের ঝড়। বাংলার ঝড়ের নাম আছে; কিন্তু এ ঝড় যেন আগের আর সব ঝড়কেই কানা করিয়া দিল। সমুদ্র ছুটিয়া ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিয়া বাঁধ ভাঙিয়া জনপদে ঢুকিয়া পড়িল—হাজারে হাজারে মানুষ মরিল, হাজারে হাজারে পশু; ঘরবাড়ি কুটুরি মরাই তৃণখণ্ডের মত গেল ভাসিয়া, লোনা জলে দীঘি পুকুর খাল বিল বিষাইয়া উঠিল।··· উত্তরে সাগরদহে এই সর্বনাশা ঝড়ের একটা ঝাপটা মাত্র আসিয়া লাগে।

শয়তানে শয়তানে মিতালি চিরদিনই আছে। কর্তৃপক্ষ সতেরো দিন এত বড় দুঃসংবাদটা চাপিয়া রাখিল, আর্তত্রাণের কোন ব্যবস্থাই করিল না, জেলার মালিক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিয়া পাঠাইল, মূর্খেরা অবাধ্যতার জন্য ভগবানের সাজা পাইয়াছে, সাহায্যের তো কথাই ওঠে না, কেহ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সাহায্য করিতে আসিলেও তাহাকে বাধা দেওয়া দরকার। তাহাই করা হইল, রিলিফ পার্টিদের প্রবেশ করিতেই দেওয়া হইল না, যাহারা এদিক ওদিক দিয়া প্রবেশ করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাদের চাল ডাল কাপড় প্রভৃতি সাহায্য-উপকরণ বাজেয়াপ্ত করিয়া ভাগাইয়া দেওয়া হইল।

শয়তানে শয়তানে এত নিবিড় মিতালির কাহিনী আর কোন দেশের ইতিহাসে আছে বলিয়া জানা যায় না।

মাস্টারমশাইয়ের রক্ত-বিদ্রোহ, চম্পা-হীরককে নিরাপদ দূরত্বে পাঠাইয়া দেওয়া—সব রহিল চাপা। শিক্ষা, সংস্কার, এমন কি স্বাধীনতা পর্যন্ত—মাস্টার মশাই যাহার জন্য প্রাণ দিলেন—প্রত্যক্ষ মৃত্যুর সামনে, ধ্বংসের এই নগ্নমূর্তির সামনে, সবই যেন অত্যন্ত লঘু হইয়া গেল। এক মুঠা করিয়া অন্ন দিতে হইবে সবার মুখে, মাথার উপর একটু চালা; কোমরে একটু আবরণ···এত কাজ;—কর্মের বিরাট মূর্তি যেন দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে; কোন্‌খানে আরম্ভ করিবে? নূতন গড়ার চেয়ে যা সব গেল সেগুলাকে অপসারিত করাই যেন বড় সমস্যা। ভাঙা ঘর, ভাঙা ডালপালা, মূল থেকে ওপড়ানো বড় বড় গাছ—মাটিতে যেন

একটু পা ফেলিবার উপায় নাই। এ ভিন্ন মানুষ মরিয়াছে, দাহ দরকার। পালিত পশু মরিয়াছে অসংখ্য, ব্যবস্থা দরকার—ত্বরায়, নয়তো মৃত্যুকে আবার আর এক রূপে ডাকিয়া আনিবে।

একটা ক্ষণিক বিমূঢ়তা আসিল, তাহার পরই কিন্তু কাজে নামিয়া গেল সবাই। নূতন রূপ জাগিল নরোত্তমের; নীরব, অতন্দ্রকর্মী, ওর যাদুস্পর্শে যেন ধীরে ধীরে শৃঙ্খলা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে আশ্রমটা ঠিক করিয়া ফেলা হইল। টানা চালার মধ্যে নিরাশ্রয় অনেকেরই জায়গা হইল, টুলু আর অন্যান্য আশ্রম-কর্মীদের বাসাগুলাও তাড়াতাড়ি তুলিয়া আরও অনেকের জায়গার সঙ্কুলান করা হইল। ওদিকে গ্রামের কাজও হইতে লাগিল, বিশেষ করিয়া আশ্রমের এলাকায় যেগুলা যেগুলা পড়ে। টুলু একটা জিনিস দেখিয়া বিস্মিত হইল—এদের একজোট হইয়া কাজ করার ক্ষমতা। চেঁচামেচি নাই, দৌড়ধাপ নাই, এতদিন যারা নীরবে চরখা ঘুরাইয়া আসিয়াছে, তাঁত বুনিয়াছে, লোহা কাঠের উপর হাতুড়ি বাটালি চালাইয়াছে, তাহারা তেমনি নীরবে মৃতের সংকার করিল, মৃত পশুগুলির ব্যবস্থা করিল—জায়গা পরিষ্কার করিয়া সরঞ্জাম গুছাইয়া ঘর তুলিতে লাগিল।

টুলুও থাকে কাজের মধ্যেই, আর সবার মতই অতন্দ্র বিরামহীন, কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া যায়। যেন 'ভিজ্‌ন্‌' দেখে—মনে হয়, যেন মাস্টার-মশাইয়েরই অমূর্ত রূপ সবার মধ্যে গেছে ছড়াইয়া—সেই ঋজুগতি, পেশীর মধ্যে সেই কর্মনিষ্ঠা, চোখে সেই শান্ত দীপ্তি, সেই শীর্ণ ব্রাহ্মণ, সেই বিদ্যুৎশিখা কি করিয়া যেন সবার অণুতে অণুতে অনুবিষ্ট হইয়া গেছে। তাঁহার চিঠির কথা মনে পড়ে—শেষের চিঠিটার, এই নিরীহ আশ্রমের চতুঃসীমার মধ্যে, এই বিরাট শান্তির মধ্যে তিনি যে কী শক্তি নিহিত করিয়া গেছেন, কী মন্ত্রে, ভাবিয়া যেন কূল পায় না টুলু। আশায় উন্মাদনায় ওর মনটা যেন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

শুধু বর্তমানই নয়, সুদূরভবিষ্যৎ পর্যন্ত সে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া গেছেন মাস্টারমশাই, আগামী যুগের প্রতিনিধি শিশু হীরকের মধ্যে।

ওর মনটা প্রবল একটা নাড়া খাইয়াছে ; আশ্চর্য হইবার কিছু নাই তাহাতে, কেন না, ও যাহা দেখিল, জীবনের প্রথম পদক্ষেপেই, অনেক শতায়ুরও সে করাল দৃশ্য দেখিবার দুর্ভাগ্য হয় না। প্রথমটা অভিভূত হইয়াছিল। আর সবার চেয়ে ঢের বেশি করিয়াই, তাহার পর শিশুর সহজ অনুকরণ-প্রবৃত্তিতেই পায়ে পায়ে আগাইয়া কাজে নামিয়া গেল। ওর দল বাড়িয়াছে, ছিন্নবস্ত্র নগ্ন সর্বহারাদের দল। অনেকেই একেবারেই সর্বহারা—হয়তো বাপ গেছে, হয়তো মা গেছে ; দু-একজন এমন হয়তো একেবারেই সব মুছিয়া গেছে ; হীরা সবাইকে লইয়া কাজে মাতিয়া ওঠে, সাধ্যের অতীত বড় বড় ডালগুলাকে ধরে সবাই দু হাতে আঁকড়াইয়া, শক্তির প্রয়োগে সবাই পড়ে নুইয়া ; ঘাম ঝরে ; কচি মুখগুলা রাঙা হইয়া ওঠে ; ধীরে ধীরে আগাইয়া চলে ; শিশুধর্মেই কাজের সঙ্গে খেলা যায় জড়াইয়া ; হীরক সরিয়া দাঁড়াইয়া কোমরে হাত দিয়া কুলি-সর্দারের বুলি আওড়াইতে থাকে—ওদিকে তার প্রতিধ্বনি ওঠে—মারো জোয়ান, হেঁইও !···বীর পালোয়ান হেঁইও ! জোরসে চলো, হেঁইও !···

কেমন একটা ঝোঁক মনের, শক্তির মন্ত্র যেখানেই শুনিয়াছে, ওর কানে আটকাইয়া গিয়াছে—স্লোগানই হোক বা কুলির ছড়াতেই হোক ; এর ওপর মাস্টারমশাইয়ের শেখানো কত গান, কত কবিতা যে আছে তাহার তো ইয়ত্তাই নাই।

নজরে পড়িল নিজের কাজের মধ্যে টুলু অন্যমনস্ক হইয়া যায় ;—ছন্দে ছন্দে চিতানো বুকে দোলা দিয়া দিয়া এক-একটা লাইন গাহিয়া যাইতেছে হীরক—ফাঁপা ফাঁপা কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুলগুলা লাফাইয়া উঠিতেছে, গৌর মুখে আকাশের আলোর অতিরিক্ত কি একটা আলো—টুলুর মনে হয়, আকাশেরও ওদিকের···টুলু অন্যমনস্ক হইয়া যায়, স্বপ্নালু হইয়া পড়ে—কয়লাখনির হীরার এই টুকরাটুকু বড় রহস্যময় বোধ হয় ওর—কোথায় এর জন্ম, কোথায় এর পালন, কোন্ পুরুষোত্তমের কাছে এর দীক্ষা—বড় আশ্চর্য লাগে—কী ভাগ্যলিপি লইয়া আসিল এ সংসারে ?

এক-এক সময় কাজ-কাজ খেলা হঠাৎ তরল লঘুতায় ভাঙিয়া চুরিয়া টুকরা টুকরা হইয়া পড়ে; কেহ হয়তো হাত পিছলাইয়া গেল ছিটকাইয়া পড়িয়া—অমন নিরেট গাম্ভীর্য এক কথাতেই ভাঙিয়া হাসির ফোয়ারা ছুটিল—এর পরে ইচ্ছা করিয়াই সবাই হাত ছাড়িয়া ছিটকাইয়া ছিটকাইয়া পড়িতে লাগিল—হাসির গায়ে হাসির ঢেউ—সেই উচ্ছ্বাসে পাথরের নুড়ির মত সবাই লুটাপুটি খাইয়া পড়িতেছে মাটিতে—যার বস্ত্র আছে, যে অর্ধনগ্ন, যে নগ্ন, যার অল্প গেছে, যার অল্পই আছে পড়িয়া, যে সব হারাইয়া একেবারে নিঃস্ব—সবাই উন্মত্ত আনন্দে একাকার হইয়া যায়।

একটা দৃশ্য টুলুর মনে হয় চিরদিনের জন্য তাহার মনে গাঁথা হইয়া রহিল। ঝড়ের তৃতীয় দিনের কথা। জ্যোৎস্নার আলোয় সমস্ত রাতই কাজ হয়, একটা চালা তুলিতে তুলিতে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, চালাটা হঠাৎ পিছলাইয়া যাওয়ায় ওপরের আড়ার কাঠে যে লোকটা বসিয়া ছিল সে বেকায়দায় পড়িয়া গিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল, নিচের আরও জনকতক কম-বেশি করিয়া বেশ ভালো ভাবেই জখম হইল।

কর্মের একটানা উত্তেজনার মধ্যে একটা বিরতি পড়িল। জন দুয়েক যাহারা খারাপভাবে জখম হইয়াছিল, নরোত্তম তাহাদের লইয়া জেলাবোর্ডের নিকটতম হাসপাতালে চলিয়া গেল। যে লোকটি মারা গেল, তাহাকে লইয়া বেশ একটা বড় দলের সঙ্গে টুলু গেল শ্মশানে।

ঝড়ের ধ্বংসলীলার চেয়ে আজকের এই ঘটনাটুকু ঢের ছোট হইলেও, কে জানে কেন, প্রাণে বড় লাগিয়াছে—সবারই। দাহ করিয়া অবসন্ন মনে ফিরিতেছিল, গ্রামের কতকগুলা বাড়ির আড়াল হইতে হঠাৎ হীরার কণ্ঠস্বর কানে আসিল—

"থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে…"

বোধ হয় শতাবধি শিশুর সমবেত কণ্ঠে আকাশটা ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল—

"থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে…"

আবার একক কণ্ঠে—

"কেমন ক'রে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে···"

আবার সেই সমবেত মন্ত্র। টুলু আর তার পেছনের দলটা থমকিয়া দাঁড়াইল।

আবার হীরক গাহিয়া উঠিল, স্বর আরও উদাত্ত হইয়া উঠিয়াছে—

"দেশ হ'তে সে দেশান্তরে—
ছুটছে ঝড়ে কেমন ক'রে···"

তাহার পর, ঐরকম প্রতিধ্বনির পরে পরে—

"কিসের নেশায় কেমন ক'রে মরতেছে বীর লাখে লাখে—
কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে···"

ঘরের কোণটা ঘুরিয়া সামনে আসিতে নজরে পড়িল, এই রাস্তারই ও প্রান্তে, আর একটা বাঁকের মুখে, উলঙ্গ অর্ধ-উলঙ্গ ধূলি-ধূসর একটা শিশু-ফৌজের আগে আগে হীরা, হাতে তার সেই কংগ্রেস-পতাকা ; ছেলেরা বেশ সুবিন্যস্তভাবে দুটির পিছনে দুটি করিয়া অনুসরণ করিতেছে।

নিতান্তই খেলা ; আশ্রমে কেহ নাই, তাই বেশ বড় করিয়া খেলা সাজাইয়া গ্রামের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে হীরা।···ঝড়, সেই মৃত্যুর মিছিল, তারপর কালিকার সেই ট্র্যাজেডি—এগুলার সঙ্গে হয়তো বা আছে সামান্য কিছু সম্বন্ধ এ খেলার, অবোধ শিশুর মন, কতটুকুই বা তার উপলব্ধি, তবুও টুলু অবসাদ থেকে ধীরে ধীরে জাগিয়া ওঠে, মনে মনে বলে—ভয় কি ? অত্যাচারে দুর্বিপাকে সিদ্ধি যদি অনায়ত্ত থাকে আমাদের তো ওরা আছে, এগিয়ে যাবেই, ওদের পরেও চলমান জীবনের পতাকা তুলে ধরবার জন্য আসবে আরও সব, মুষ্টিতে আরও শক্তি ; বক্ষে আরও উন্মাদনা নিয়ে—পথ কেটে চল, যতটুকু পার, যতক্ষণ পার—ওদের যাত্রা সুগম ক'রে দাও···

৮

সেই দিন সন্ধ্যার কথা। এ তিন দিন সারারাত মেহনতের পর টুলু ভোরের দিকে ছটাক খানেক ঘুমের ব্যবস্থা করিয়া লইতেছিল। কাল সেটুকুও হয় নাই, আজ সব জিনিসই বিলম্বিত; এই সবে আহার সারিয়া উঠিয়াছে। চোখের পাতা দুইটা পাহাড়ের মত ভারী হইয়া উঠিয়াছে। নিতান্ত অবশ হইয়াই একবার একটু গড়াইয়া লইবার জন্য ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, চম্পা বাহির হইতে ত্রস্তভাবে উঠানে প্রবেশ করিয়া বলিল—"দেখুন এসে, এ কি কাণ্ড!—কখনও দেখি নি!"

বিস্ময়ে চোখ দুইটা যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। টুলু প্রশ্ন করিল—"কি?"

"দেখুন না বেরিয়ে, বললে বিশ্বাস করতে পারবেন না।"

ক্লান্তি আর বিরক্তিতে টুলুর মুখটা একটু কুঞ্চিতই হইল, চম্পা ততক্ষণে আবার দরজার কাছে চলিয়া গেছে, বাহিরের দিকে চাহিয়া আরও শিহরিয়া বলিয়া উঠিল—"এ কি সর্বনাশ!"

ঘুরিয়া টুলুর দিকে চাহিল, সেও তখন পাশে আসিয়া গেছে, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সামনের দিকে চাহিয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

হীরার মিছিলের মতই একটা মিছিল, তবে শুধু শিশুদের নয়,—বৃদ্ধ থেকে শিশু পর্যন্ত সব বয়সের লোক, মেয়ে পুরুষ দুইই; কাহারও কোলে শিশু, কাহারও হাতধরা; ক্লান্ত; মিছিলের সামনের অংশটা আশ্রম-প্রাঙ্গণের ওদিকটায় প্রবেশ করিয়াছে, একটা কলরব—কিন্তু চাপা, কণ্ঠে যেন কাহারও শক্তি নাই।

আশ্রমের মধ্যে থেকেও লোকেরা দরজার মুখে বাহির হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহারা এদিক ওদিক কাজ করিতেছিল, তাহারাও।

টুলু চম্পার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"ব্যাপার কি?"

চম্পা বলিল—"আমাদের যেখানে ফ্যান ঢালা হয়, একটা রোগা ডিগডিগে পুরুষ আর একটা বছর দশেকের মেয়ে ফ্যান তুলে খাচ্ছিল, দূর থেকেই দেখে আপনাকে ডাকতে আসি, কিন্তু এ কি!"

ততক্ষণে মিছিলটা আরও আগাইয়া আসিয়া প্রাঙ্গণের ওদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কোলাহলটাও স্পষ্ট—"হ্যাঁগা, এখানে কারা খেতে দিচ্ছে?··· আমরা দুদিন খাই নি···আমি তিনদিন···কিছু নেই আমাদের···কারা দিচ্ছে, হ্যাঁগা?···"

ফ্যানের নালার কাছ থেকে হঠাৎ একটা আহ্বান—"ওগো, ইদিকে! ইদিকে!—ফ্যান—অনেক—গরম···ও পেসাদি!···হারাণ!···গুপির মা!···"

সব যেন স্থাণুর মত নিশ্চল হইয়া গেছে। নদীর ধারটায় মাটি খুঁড়িয়া টানা উনুন, সেইখানেই ঢালোয়া রান্না হয় আজকাল, ফ্যানের নালাটা নদীতে গিয়া মিশিয়াছে; শব্দ লক্ষ্য করিয়া মিছিলের একটা অংশ ছুটিল সেদিকে—পড়িয়া, উঠিয়া।

টুলুর যেন চমক ভাঙিল।—"যেও না ওদিকে। যেও না। হাত দিয়ো না ফ্যানে।"—বলিতে বলিতে চম্পাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল, গলার স্বর কর্কশ হইয়া উঠিতেছে—"যাবে না বলছি—ফ্যানে হাত দিতে পারবে না—খবরদার!···তোমরা রুখছ না কেন?—হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ··· ফ্যানে আমাদের কাজ আছে···কেউ ছুঁতে পারবে না।···"

ওদের আবির্ভাবের চেয়ে টুলুর আচরণটা কম বিস্ময়কর নয়। আশ্রমের সবাই, এদিকে চম্পা পর্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গেছে। টুলু গিয়া ফ্যানের নর্দামার সামনে রুখিয়া দাঁড়াইল, একটা পোড়া কাঠও হাতে তুলিয়া লইল। যাহারা ছুটিয়া গিয়াছিল তাহারা তো থমকিয়া দাঁড়াইলই, যাহারা নিমন্ত্রণ দিয়াছিল—একটি ন্যাকড়া-পরা মেয়ে আর একজন মাঝবয়সী পুরুষ—তাহারাও তাড়াতাড়ি উঠিয়া শঙ্কিতভাবে ভিড় ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। মিনিট খানেক একেবারে নিঃশব্দ, দুই পক্ষই বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া; তাহার পর টুলু প্রশ্ন করিল—"কোথা থেকে আসছ তোমরা? চাও কি?"

নানা উত্তরে, নানা মিনতিতে আবার একটা মিশ্র কলনাদ উঠিতেছিল, টুলু হাত বাড়াইয়া একজন বয়স্থ লোককে সঙ্কেত করিয়া বলিল—"তুমি এগিয়ে এস। ···কি ব্যাপার? কোথা থেকে আসছ সব?"

হাতজোড় করিয়া সমস্ত শরীরটা কুঁজো করিয়া লোকটা অসীম মিনতিতে মাথা ঢুলাইয়া বলিল—"আমরা আসছি দক্ষিণ থেকে বাবুমশাই, তিন দিন হেঁটে, তিন দিনই কিছু খাই নি এক রকম···বুঝছি, এতগুলোকে কে খেতে দেবে—বলি, আলাদা হয়ে পড়—যায় না···অবিশ্যি গেছেও ছড়িয়ে, আরও ছিল, কিন্তু তবুও···"

লোকটা একবার পেছন দিকে ফিরিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল—"তা, আমরা শুধু ফ্যান খাব বাবুমশাই। আর···"

আশ্রমের চালাটার দিকে একবার লুব্ধভাবে চাহিয়া দৃষ্টিটা তখনই ফিরাইয়া আনিয়া বলিল—"থাকব বাইরেই প'ড়ে···ঘরে ঢুকতে যাব নি···"

আশ্রমের সবাই আসিয়া টুলুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, পাশে চম্পা, হীরক তাহার বাঁ হাতটা দুই হাতে জড়াইয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

টুলু প্রশ্ন করিল—"দক্ষিণ থেকে আসছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের থানা সুতোহাটা নন্দীগাঁ···"

"কি হয়েছে সেখানে?—ঝড়?—এই রকম?···"

"এই রকম কি বাবুমশাই?—ওসব জায়গা আর নেই। সরকারী বাঁধ ভেঙে সাগরের নোনা জল—বালি···গ্রাম বলতে কিছু নেই—গরুবাছুর, মানুষ···"

ভিড়ের এক প্রান্তে একটি মেয়ে হঠাৎ মুখ ঢাকিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; লোকটা ঘুরিয়া দেখিয়া চটিয়া উঠিল, বলিল—"আরে, বুলতে দে!···জ্বালা!···তোর একার গেছে?···"

কাঁদা দেখিয়া চম্পার যেন সাড় হইল, আগাইয়া গিয়া মেয়েটির পিঠে হাত দিয়া বলিল—"এদিকে এস তুমি।"

তাহাকে লইয়া বাড়ির দিকে পা বাড়াইয়াছিল, টুলু বলিল—"চম্পা, একটু থেমে যাও।"

লোকটিকে বলিল—"আচ্ছা, যাক ওসব কথা। তোমরা আছ কতজন ?" সঙ্গে সঙ্গে নিজেও একটু গলা তুলিয়া দেখিয়া লইল, তাহার পর আবার প্রশ্ন করিল—"আরও আসছে কি পেছনে ?"

লোকটা একটু থতমত খাইয়া গেল, যেন একটা কিছু লুকাইতে চাহিতেছে, কিন্তু কোন ফল নাই, এখনই প্রকাশ হইয়া পড়িবে; পিছন দিকে একবার অনির্দিষ্টভাবে চাহিয়া বলিল—"ওরাও ইদিকেই আসবে ?…হ্যাঁগা, তোদের কি বললে ?—বনগাঁ-বারুলির ওরা ?"

কি একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় কেহই উত্তর দিল না।

টুলু প্রশ্ন করিল—"কজন আছ ?"

লোকটা আবার সেইরকমভাবে থতমত খাইয়া গেল। টুলু প্রশ্ন করিল—"আর এই এত কটি ?"

দারুণ বিপদের মধ্যে লোকটার হঠাৎ যেন মাথা ঘুলাইয়া গেল, প্রশ্নটার সোজা উত্তর না দিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—"তা এসে যায়ই তো তাদের খেদিয়ে দিও আপনারা বাবু। আমরাও ঢুকতে দোব নি।…কত লোককে বাবুরা ফ্যান দেবে ? গরুবাছুর নাই তাদের ?…অ—রে !"

শেষের কথাগুলা নিজের দলের দিকে চাহিয়া অনাগত দলকে লক্ষ্য করিয়া কতকটা রাগের টোনে বলিল, বাবুদের হইয়া একটা যেন ঘোরতর অন্যায়ের বিরুদ্ধে ওকালতি করিতেছে।

একটু দূরে নদীর ঢালু থেকে উঠিয়া আসিয়া একটি গরু আর একটি বাছুর নালাটায় মুখ দিয়াছে, সেটা দেখিয়াই বোধ হয় লোকটার গরুবাছুরের কথা মনে পড়িয়াছে। একটি স্ত্রীলোক কতকটা শঙ্কিতভাবেই সেদিকে চাহিয়া বলিল—"আর উরা তো ভাতই পাবে ব'লে গেচে রাজার কুটিতে। আমরা কিছু বলেচি ?"

একটি মেয়েই একটু টানিয়া বলিল—"হুঁ, দিলে !—দেখেচি···"

স্ত্রীলোকটি তাহার উপরেই মুখ-ঝামটা দিয়া উঠিল—"না দেয় আমরা ঢুকতে দোব নি এখানে।···গেল কেন ?"

টুলু অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছিল। ভিড়ের পিছন থেকে একটা ঢিল গিয়া গরু দুইটার মুখের কাছে পড়িল, একবার দেখিয়া লইল, কিন্তু কিছু বলিল না। স্ত্রীলোক দুটিকে বলিল—"তোমরা ঝগড়া করছ কেন অযথা ? আমার কথাটার তো উত্তর দিলে না, কতজন হবে তারা ?"

পিছন থেকে একজন বলিল—"আর এত কটিই হবে বাবুমশাই।···বলচে না কেন সোজা কথাটা ?"

টুলু চম্পার দিকে চাহিয়া বলিল—"প্রায় ষাটজন, মনে হচ্ছে এসেই পড়বে ওরাও। পারবে ? না, আমরা বেটাছেলেরাই হাত লাগিয়ে দোব ?"

চম্পা একটু রাগ আর অভিমানের স্বরে বলিল—"হ্যাঁ, সেই ঠিক, আমরা বরং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখি, তামাশা দেখবার অভাব প'ড়ে গেছে তো বড্ড ক'দিন থেকে ?"

"তা হ'লে ত্রিশ জনের ব্যবস্থা করো—এই যা রয়েছে।"

"সে আমি বুঝে সুঝে ঠিক করছি, ওরাও এসে পড়বে, আরও না আসে ! ব্যাপারটা বুঝছেন না ?···থাকবার কি হবে ? অনেক কচি-কাচা।"

টুলু, বেটাছেলে যাহারা জড়ো হইয়াছিল তাহাদের বলিল—"আশ্রমের বাকিটাও এখুনি তুলে ফেলতে হবে গো, অন্তত খুঁটির ওপর চালাটা।"

একটু কুণ্ঠিতভাবেই বলিল—"ভেবেছিলাম বড্ড ক্লান্ত রয়েছ—আজ রাত্তিরটা আর কাজ হবে না, তা কি করি ?"

কয়েকটা কণ্ঠেই উৎসাহের সঙ্গে উত্তর হইল—"তা উঠবে, উঠবে না কেন ?··· মা-মণি না হয় ছেড়ে দিক না, রান্নাটাও সেরে নিচ্ছি আমরা—কি আর এমন··· হ্যাঁ, কজন না হয় উদিকেই যাই।"

চম্পা কিছু বলিবার পূর্বেই টুলু বলিল—"ওকে বলতে যাওয়া বৃথা, শুনলে না

উত্তরটা ? চল, হাত লাগিয়ে দিগে।···তোমরাও চল ওদিকে, আগুনের হাঙ্গাম এখানে, অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা রয়েছে।···আমরা কিন্তু আর ডাকলেও আসব না চম্পা, সামলাও।"

চম্পা উত্তর করিল—"আপনারা ওদিকে সামলাতে না পারলে বরং আমাদের ডেকে নেবেন।"

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই রকম ঠেস দিয়া কথা-কাটাকাটিতে মিষ্ট হাসিই আসে, সবার মুখে তাহার আভাসই একটু একটু ফুটিতেছিল, হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন প্রৌঢ় বাহির হইয়া টুলুর একেবারে সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল—"ভাত খেতে দেবেন নাকি—রেঁধে ?"

কি একটা আছে চেহারার মধ্যে, টুলুর উত্তর জোগাইল না।

লোকটা বলিল—"আমি এদের পুরুত ছিলুম···ব্রাহ্মণ···চার মরাই ধান থাকত—স্ত্রী, দুটি ছেলে···ফ্যান কখনও খেতে হয় নি, তাই বলছিলাম···"

কথাগুলা বলিবার কোনই দরকার ছিল না, কিন্তু একেবারে ভিখারীর মত বর্তাইয়া গিয়া আনন্দ যেন ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। অথচ মর্যাদাজ্ঞান থাকার জন্য নিজেকে সংযত করিবারও চেষ্টা আছে ; অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছে।

টুলু তাহার ডান হাতটা ধরিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল—"না, ফ্যান খাবেন কেন—আমাদের যখন একমুঠো জুটছে ?"

"খেয়েছি, সে কথা নয় ; এতর পরেও তো প্রাণধারণ করতে হয় ; তবে, সব মনে প'ড়ে যায়, গলা দিয়ে কেমন যেন নামতে চায় না···সেই কথাই বলছিলাম—ভাতের জন্যেই যে তা নয়।"

অগ্রসর হইতে হইতে কোঁচার খুঁট দিয়া উদ্গত অশ্রু মুছিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"উঃ, এ কি সর্বনাশ ! কাকে বলি ? কে বুঝবে ?"

৯

চম্পার আন্দাজটা ঠিক ছিল—আরও না আসে!

সেই রাত্রেই প্রায় আশিজন আসিয়া পড়িল, ছোটবড় কয়েকটা দলে। এক দল রান্নার প্রায় শেষাশেষি আসিল, জন পনেরো; এক দল এদের খাওয়ার মাঝামাঝি—ভাতের গন্ধে বুভুক্ষু রব করিতে করিতে বিশৃঙ্খল ভাবে ছুটিতে ছুটিতে—কাতার দিয়া বসিয়া গেল, ঠেলিয়া বসিবারও চেষ্টা করিল। ওদিকে আবার ফ্যানের নর্দমার ওপর অভিযান—শক্ত হইয়া উঠিল শৃঙ্খলা বজায় রাখা। সুবিধার মধ্যে ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত। টুলু—পরিবেশনের দল, এদের সামলাইয়া রাখিবার দল, ওদিকে ঘর তুলিবার জন্য আলাদা দল ভাগ করিয়া দিল। আবার রান্না চড়িল সঙ্গে সঙ্গেই।...সব ঠিকঠাক করিয়া যখন এইবার আরাম করিতে যাইবে, একটা ছোট দল আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার গায়ে আর একটা—দুইটা মিশিয়া জন দশ-বারো হইবে। টুলু ভীতভাবে চম্পাকে প্রশ্ন করিল—"মাটি ফুঁড়ে বেরুচ্ছে নাকি? সমস্ত রাত চলবে?"

চম্পা সে কথার উত্তর না দিয়া শুধু বলিল—"ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে দেখছি ওদিকে! শুনছিলাম অনেক দিন থেকেই দুর্ভিক্ষের মতন আরম্ভ হয়ে গেছে—তার ওপর এই ঝড়, বাঁধ ভেঙে সমুদ্র ঢুকে পড়া!..."

"চাল ডাল মেপে দিচ্ছি, রেঁধে নিক নিজেরাই; তোমরা অসুখে প'ড়ে যাবে।"

কথাটা এত যুক্তিযুক্ত যে কাটান্ দিতে চম্পাকে একটু ভাবিতে হইল, বলিল—"তাই ভাল হ'ত, কিন্তু এদের বিশ্বাস আছে?—চালডাল চুরি করবে। রান্না ক'রেও নিজের দিকে টানবে; মানুষের মধ্যে তো আর নেই, দেখছেন না?"

"সে আমি জেগে থেকে সামলাচ্ছি।"

চম্পা আবার সেবারের মত ব্যঙ্গের সহিত বলিল—"হ্যাঁ, সে বরং দিব্যি হয়। আমরাও একটু নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে পারি।"

তাহার পর ভঙ্গি বদলাইয়া বলিল—"আপনি দয়া ক'রে ওদিকে যান তো, সত্যিই ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে। তেমন হুঁশ নেই, একটা কড়া কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লে বলবেন—দেখছ, চম্পা বললে!"

শেষরাত্রের দিকে আরও একটা দল আসে। আসিয়াই বোধ হয় ফ্যানের রজতধারার উপর দৃষ্টি পড়িয়া গিয়াছিল, কাহাকেও আর উঠায় নাই। অল্প যে গোলমাল হইয়া থাকিবে তাহাতে কাহারও ঘুম ভাঙিবার মত অবস্থা ছিল না।

সকালে উঠিয়া দেখা গেল ধারাটার পাশে ছুটি মৃতদেহ—একটি বৃদ্ধার—শেষ-রাত্রের দলে আসিয়াছিল; আর একটা দশ-বারো বছরের ছেলের—প্রথম দলেই আসিয়া পরিতৃপ্তভাবেই আহার করিয়াছিল, আবার বোধ হয় শেষরাত্রের গোলমালে উঠিয়া পড়ে, তাহার পর লোভ সামলাইতে পারে নাই।

একটা মস্তবড় সমস্যার সামনে পড়িয়া টুলু যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল। পরের দিন আরও লোক বাড়িল, বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম, নোংরামি—এও একটা যেন ঝড়, মৃত্যুকে অন্য পথ দিয়া লইয়া আসিবে। কাছে পিঠে ডাক্তারও নাই, ভরসা মাস্টারমশাইয়ের হোমিওপ্যাথির বাক্সটুকু; টুলুর অভ্যাসও নাই আর। ডাক্তার বলিতে চম্পা, তাহার হেঁসেল ছাড়া চলে না,—যমকে বুভুক্ষার দিকে আটকায়, কি রোগের দিকে?

আশ্রমের প্রাঙ্গণটা বেশ বড়, টুলু যোগাড়যন্ত্র করিয়া আরও একটা লম্বা চালা তুলিয়া ফেলিল, আরও গোটা-তিন টানা উনান খোঁড়াইয়া আলাদা আলাদা রাঁধুনিদের ব্যাচ করাইয়া দিল। চম্পাকে রাঁধার কাজ থেকে জোর করিয়া সরাইয়া হেঁসেলগুলার তদারকে আর ঔষধের দিকে লাগাইয়া দিল। ফল ভাল হইতেছে দেখিয়া চম্পা আর আপত্তি করিল না; তবে হেঁসেলের সামান্য একটু

রাখিল নিজের হাতে,—নিজেদের চারজনের রান্নাটা, যে মেয়েছেলেটি বাড়িতে শোয় তাহাকে ধরিয়া।

গড়িয়া তুলিয়াছে খানিকটা শৃঙ্খলা, তবুও মাঝে মাঝে যায় ভাঙিয়া,—নিত্যই নূতন দল আসিতেছে, দুজন, পাঁচজন, দশজন, আরও বেশি। তৃতীয় দিন পর্যন্ত আড়াই শত লোক হইয়া পড়িল।···তবু চলিতেছে কাজ, শুধু টুলুর মুখে মাঝে মাঝে বাহির হইয়া পড়ে—"নরোত্তম এখনও এল না ফিরে···নরোত্তম থাকলে বাঁচতাম · আসে না কেন?"

চতুর্থ দিন প্রাতে নরোত্তম আসিল। বলিল, যাহাদের হাসপাতালে লইয়া গিয়াছিল তাহারা জায়গা পাইয়াছে, সারিয়া উঠিলেই চলিয়া আসিবে, একটু দেরি হইবে।

টুলু বলিল—"তোমার বড় দেরি হ'ল নরোত্তম; অবস্থা দেখছ? ভর্তি ক'রেই বেরিয়ে পড়তে পারতে! আমার সব নতুন এখানে···"

নরোত্তম উত্তর করিল—"পড়েছিলাম বেরিয়ে, তবে একটু অন্যত্র গেছলাম।"

"কোথায়?"

নরোত্তম একটু ভাবিল, কতকটা যেন দোমনা থাকিয়া বলিল—"সে অনেক কথা, অন্য এক সময় বলব, এখন একটু দেখে নিই এদিকটা আগে। বড্ড একলা প'ড়ে গেছলেন···একটু ভুল হয়ে গেল আমার।"

সমস্ত দিনের মধ্যে অনেকটা সামলাইয়া ফেলিল। সব চেয়ে বড় কাজ—সংখ্যাটা বাড়িতে দিল না, বরং কিছু কমাইয়াই ফেলিল। খোঁজ লইতে লইতে আসিয়াছে—কোথায় কোথায় অন্নসত্র খোলা হইয়াছে, লোক লইতে পারে; নূতন যাহারা আসিতে লাগিল, একটা আহার দিয়া আপনার লোক দিয়া তাহাদের সরাইয়া দিতে লাগিল। দিন চারেকের মধ্যে আশ্রমের সংখ্যাটাও আড়াই শত হইতে দুই শতে আনিয়া ফেলিল। বেশ একটি শৃঙ্খলা আসিল, গ্রাম-সংস্কারের কাজ আবার চালু হইল ভাল করিয়া; দুঃখের বাদলের গায়ে রুপালি রেখাও দিল দেখা—যাহারা আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে সক্ষম মাত্রেই এই সংস্কারের কাজে

নিতান্ত যেন একটি সহজ কর্তব্যবোধে ধীরে ধীরে আত্মনিয়োগ করিল, ওদের দলের স্ত্রীলোকেরাও প্রথম ধকোলটা সামলাইয়া লইয়াই নিজেদের মধ্যে বেশ গোছগাছ করিয়া লইয়া ছেঁসেলে নামিয়া গেল ; এমন কি চরখার রবও উঠিল আবার আশ্রমের প্রাঙ্গণে।

টুলু একটা জিনিস লক্ষ্য করিল—আশ্রমসংলগ্ন গ্রামবাসীদের সঙ্গে ওদের চমৎকার একটি মিল আছে,—নিঃশব্দে, সংযত উৎসাহের সঙ্গে কাজ করিয়া যাওয়া, কাজ খুঁজিয়া লইয়া। সবচেয়ে বড় কথা, এদেরই মত দারুণ বিপর্যয়ে ক্ষণিকের জন্য মানুষ্যত্ব হারাইয়া আবার আরও যেন ভালো করিয়া মানুষের মর্যাদায় ফিরিয়া আসার ক্ষমতা। টুলু নরোত্তমকে বলিল, নরোত্তম একটু হাসিয়া বলিল—"ওরা আবার তমলুক-কাঁথি অঞ্চলের লোক যে !..."

একটু বেশি ব্যস্ত ছিল, এইটুকু বলিয়াই চলিয়া গেল।

চম্পাকেও বলিল টুলু। চম্পা একটু যেন নিগূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"হ্যাঁ, লক্ষ্য করেছি ; শুধু এইটুকুই নয়, যা কথা শুনলাম একটা মেয়ের মুখে..."

টুলু প্রশ্ন করিতে বলিল—"আমার পাশে দাঁড়িয়ে রাঁধছিল, বয়স তিরিশ বত্রিশ হবে, বিধবা ; এই সব কথাই হচ্ছিল, হঠাৎ ঘুরে আমার দিকে চেয়ে বললে—'আমরাও চুপ ক'রে থাকব না, টলিয়ে ছেড়ে দোব।...' জিগ্যেস করলাম—'কি টলিয়ে ছাড়বে ?'...ততক্ষণে মনে হ'ল কে যেন এদিক থেকে চোখ টিপে দিলে, চেপে গেল দেখে আমিও আর কিছু জিগ্যেস করলাম না।"

একটু হাসিয়া কপট গাম্ভীর্যের সহিত বলিল—"সর্বনেশে জায়গা বাপু এ, কেমন যেন গা-ছমছম করে...মাস্টারমশাইও ওইভাবে গেলেন..."

হীরকের কী যে হইয়াছে, আর সে রকম দল গুছাইয়া পতাকা হাতে স্লোগান আওড়াইয়া বেড়ায় না। মা বাবা কেহই ওকে আর সময় দিতে পারে না ; তবে দুজনেই বুঝিয়াছে, ঝড় ওকে যেভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল, এই দুর্ভিক্ষের দৃশ্য সেভাবে পারে নাই ; দেখে ঘোরে, ওরা যখন খায়—শুধু খিচুড়ি আর একটু

করিয়া শুন—ফ্যালফ্যাল করিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া খাওয়া দেখে একটা রোগা ডিগডিগে ছোট মেয়ের। বাপ মা কেহই নাই মেয়েটার, কি করিয়া দলের সঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে, রোগা বলিয়া একটু কম দেওয়া হয় তাহাকে, খাইবার সময় তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া চারিদিকে চায় আর হাতটা খুব চাটে।··· মাঝে মাঝে হীরা এক-আধটা প্রশ্ন করে বাবাকে মাকে, উত্তর যা পায় তাই লইয়া নদীর ধারটিতে বসিয়া মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে থাকে—শিশুমনে যেন অর্থ উপলব্ধি হয় না।···অবশ্য ওর প্রশ্নের সঙ্গে খুঁট মিলাইয়া মিলাইয়া সবিস্তারে উত্তর দিবার অবসরও নাই ওদের, টুলু এক-আধবার বিরক্ত হইয়া সরাইয়া দিয়াছে।

একটা নূতন দোষ দেখা দিয়াছে—আবদার। অন্যান্য সময় ছন্নছাড়ার মত ঘুরিয়াই বেড়ায়, মুখটা চুন করিয়া; কিন্তু যখনই মা একটু মনোযোগ দিবার অবসর পায় ওর দিকে—সাধারণত নাওয়ানো-খাওয়ানোর সময়—কোন কিছু একটা আবদার ধরিয়া কান্নাকাটি করিয়া হুলুস্থূল কাণ্ড বাধাইয়া তোলে—দাদুকে চাই তখনই, কিংবা ভাত হইল তো খিচুড়ি চাই সদ্যসদ্য, কিংবা নিতান্তই অর্থ-হীন একটা কিছু; টুলু চম্পা দুজনে মিলিয়া হিমসিম খাইয়া যায়; এক-একদিন চম্পা টুলুর হাতে ছাড়িয়া সরিয়া পড়ে, বলে—"সামলান ছেলে, আমি আর রুখতে পারছি না, এইবার ওর অদৃষ্টে কোন্‌দিন মার আছে, যেটা বাকি।"

আজ সকালে নরোত্তম আসা অবধি ও একটু চনমনে হইয়াছে, সর্বদাই তাহার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সব কাজেই; তাহার মধ্যেই গল্পও হইতেছে—মুক্ত নিঃসঙ্কোচ প্রশ্ন, আর ওদিকে কার্পণ্যহীন বিরক্তিহীন উত্তর, গল্প করিতে করিতেই প্রবল উৎসাহে কাজের সরঞ্জাম এটা ওটা জোগাইয়া দিতেছে নরোত্তমের হাতে।

মুক্ত প্রশ্ন-উত্তরে কি সব ঠাহর করিয়াছে—দুপুরে খাইবার সময় ডাল আর তরকারি ঠেলিয়া রাখিয়া বলিল—"আমি ওদের মতন খাব।" একটি তরকারি রাঁধে চম্পা, চম্পা সেটা কোন মতেই মুখে দেওয়াতে পারিল না। তবে কান্না-কাটি করিল না আজ, ওদের খিচুড়িতেও যে ডাল আছে সেই যুক্তি দেখাইয়া

চম্পা ঐ পর্যন্ত কোন মতে রাজী করিল। তরকারি না খাইয়া উৎসাহটা বাড়িল। বিকালে দল গুছাইয়া একবার গ্রাম প্রদক্ষিণও করিয়া আসিল, চারদিনের মধ্যে এই প্রথম।

সন্ধ্যার সময় নিশ্চিন্ত হইয়া আবার দুই ভাইয়ে কি জোর আলোচনা হইতেছিল, টুলু সেই দিক দিয়া যাইতে যাইতে দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল—"আজ তোমার দাদা-ভাই তরকারি খায় নি নরোত্তম।"

নরোত্তম হাসিয়া বলিল—"শুনলাম, ও-ই বাহাদুরি ক'রে শোনালে। আমারই দোষ, সকালে কখন কি জিজ্ঞেস করেছে, অন্যমনস্ক হয়ে উত্তর দিয়ে বলেছি, তাই থেকে ওইটে মাথায় ঢুকে গেছল। তা এবার থেকে খাবে আমায় কথা দেছে, মা-মণি যেন রাঁধে।" হীরা আসিয়া টুলুর ডান হাতটা বুকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল—"তরকারি না খাওয়ার চেয়ে মার কথা না শোনা যে বড্ড খারাপ, বুঝলে না বাবা? তাই খাব।"

ওরই গুরুগিরি এসব, নরোত্তম একটু অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া বলিল—"ঐ আবার শাস্ত্রবচন শুনুন।" একটু থামিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনার এখন ফুরসৎ আছে?"

টুলু হাসিয়া বলিল—"অভাবটা কবে ছিল? তুমি এসে অবধি আবার সবটাই তো ফুরসৎ।"

নরোত্তম বলিল—"সে কথা একশ' বার, দেখচি তো।"

হীরার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল—"তরকারির কথাটা আমার হয়ে তুমিই বলো গে দাদাভাই। আর বলবে, আমিও খাব।"

টুলু আসিয়া বলিল—"সে কথা আর ব'লো কেন? আজ সমস্ত দিন আপশোষ চম্পা, তোমার জন্যে রান্না করতে ভুলে গেছে ব'লে; যখন মনে পড়ল তখন তোমার ওদিকে খাওয়া হয়ে গেছে। বলে—মুখ দেখাব কি ক'রে নরুর কাছে?"

হীরাকে সরাইয়া দিবার সুযোগটা হাতছাড়া করিল না নরোত্তম, বলিল—

"ঐ শোন, দাদাভাই, হঠাৎ অনেক নতুন ছেলেমেয়ে পেয়ে মা-মণির আর বুড়ো ছেলের কথা মনে থাকবে না, তুমি ব'সে থেকে আমার দুটো তরকারির জোগাড় করোগে।"

১০

হীরা নাচিতে নাচিতে বাসার দিকে চলিয়া গেল, যতক্ষণ দেখা গেল হাসির সঙ্গে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল নরোত্তম, তাহার পর ঘুরিয়া বলিল—"আপনাকে খুঁজছিলাম, বসুন ঐ গুঁড়িটার ওপর।···চাল নেই আর।"

গ্রামগুলায় চাল-ডালের অবস্থা ভালই বরাবর, ঝড়ে ওদিক দিয়া খুব বেশি ক্ষতি হয় নাই, টুলু বিমূঢ়ভাবে বলিল—"সে কি!···আমায় তো বলে নি কেউ; অভাব দেখছি না তো!"

"এরা বলবার পাত্র নয়, শেষ পর্যন্ত জুগিয়ে জুগিয়ে যাবে, পণ্ডিতমশাই সেই ভাবে তোয়েরই ক'রে গেছেন এদের। কিন্তু আমি এসেই হিসেব ক'রে দেখছি, গ্রামে আর মাত্র পাঁচদিনের চাল আছে।"

"তারপর?"

"তারপর এদের স্বদ্দু উপোস।···এদের ঐ রকমই অব্যেস, কিছু না ব'লে কাজ ক'রে যায়; সামলাবার মালিক ছিলেন পণ্ডিতমশাই, কিছু কিছু আমি; এখন হয়েছেন আপনিই তাঁর জায়গায়।"

অসহায়তায় টুলুর চোখ দুইটা আয়ত হইয়া উঠিল, মুখ দিয়া আপনিই আপনিই যেন বাহির হইয়া পড়িল—"সর্বনাশ!"

নরোত্তম বলিল—"এর চেয়ে বড় সর্বনাশ সামনে রয়েছে···"

চিন্তাবশেই টুলুর মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়া গিয়াছিল, চকিতে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—"আবার কি?"

"এখানে বাইরের লোক আরও বাড়বে—শীগগিরই, অবিশ্যি যদি খেদিয়ে না দেন,—তাও সহজ হবে না···"

"কেন?"

"চারিদিকেই চাল ক'মে যাচ্ছে, যেখানে যেখানে অন্নসত্র খুলেছে।"

"কেন? রিলিফ আসছে তো বাইরে থেকে, কলকাতা থেকে…"

"কলকাতায় এখনও খবরও পৌছায় নি—গবর্মেণ্ট পৌছতে দেয় নি…"

"সে কি!"

"তাই।…কাছাকাছি—মানে, আওয়াজটা আপনি আপনি যতটুকু গেছে—সেখান থেকে যে সাহায্য আসছিল, গবর্মেণ্ট তাদের রুখে দিচ্ছে, কেড়ে নিচ্ছে—মারপিটও করছে অনেক জায়গায়…"

"তার মানে?"

নরোত্তম যেন অন্তরের পৈশাচিক উল্লাসে টুলুর দৃষ্টির মধ্যেকার বর্ধিত বিস্ময় আর উদ্গত ক্রোধটা লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিল, বলিল—"তার মানে, মেদিনীপুরের সাজা হওয়া দরকার—বড্ড বেড়েছে এরা। জেলার কর্তারা চারিদিকে ঐ রকম হুকুম তো দিয়েচেই, ওপরেও নাকি ও-রকম লিখেচে—ঝড়টা ওদের মতে ভগবানেরই একটা সাজা—গবর্মেণ্টের ওতে হাত দেবার দরকারও নেই, উচিতও নয়…"

টুলুর মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—"শয়তানের দল! উঃ, পণ্ডিতমশাই-ই এদের ঠিক চিনেছিলেন…তায় আবার দুই শয়তানে মিতালি হয়েছে তো…" পরমুহূর্তেই ওর মনটা কিন্তু দৃষ্টির নিচেই কঠিন বাস্তবে ফিরিয়া আসিল, আবার রাগের জায়গায় আসিয়া পড়িল আশঙ্কা, বলিল—"উপায় কি হবে নরোত্তম? দুর্ভিক্ষ বাঁচাতে গিয়ে আরও বড় দুর্ভিক্ষ ঘাড়ে এসে পড়ল যে!…ওদের উপর আক্রোশ ক'রে কি হবে?…উপায় কি এখন?—পাঁচ দিন মোটে…"

নরোত্তমের দৃষ্টি একটু দূরে গিয়া পড়িয়াছিল, আক্রোশের কথাটার ওপর যেন একটা টীকা করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"হ্যাঁ, এখন ঠিক আক্রোশ মেটাবার সময় নয় বটে…"

"এখন" শব্দটার উপর একটু জোর দিয়াই বলিল কথাটা। তাহার পর টুলুর

মুখের পানে একবার চকিতে চাহিয়া লইয়া বলিল—"উপায় নতুন কি আমার মাথায় তো আসছে না, শুধু…শুধু…পণ্ডিতমশাই এ অবস্থায় কি করতেন সেইটে বলতে পারি।"

টুলুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। অদ্ভুত দৃষ্টি, শান্ত অথচ ভিতরে আগুন। টুলু প্রশ্ন করিল—"কি করতেন?"

ভিতরের আগুন আরও একটু ঠেলিয়া বাহিরে আসিল, একটু চুপ করিয়াই রহিল নরোত্তম, তাহার পর বলিল—"জেলায় চাল আছে প্রচুর—বড় বড় আড়তদারদের গোলায় আটকে রেখেচে চাল, মোটা লাভ মারবে, এখানেই বা বাইরে চালান দিয়ে যেমন স্থবিধে হয়…"

"বেশ তো, কিছু কিনে ফেলা যাক।"

"ওরা বেচবে না আমাদের কাছে, জানে সে দর দেবার সাধ্যি আমাদের নেই। এই হ'ল এক। দ্বিতীয় কথা, ওরা বেচতে চাইলেও গবর্মেণ্ট আটকাবে। শুনলেন তো তাদের কথা সব—'সাজা দেওয়া দরকার মেদিনীপুরের লোককে।'

"তা হ'লে?"

নরোত্তম একটু যেন ভিতরে ভিতরে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে, যেন আর কত স্পষ্ট করিয়া বলিবে?…তাহার পর সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বলিল—"ইয়ে, আপনি দনীপুরের ব্যাপারটার কথা শুনছেন?"

একটা আলোক দেখিতে পাইল যেন টুলু, একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"কিছু কিছু। লোকেরা চালের কলের ওপর চড়াই করে, গভর্মেণ্ট কলওয়ালাদের পক্ষ নেয়—কিছু লোক খুন হয়।"

"সবটা শোনেন নি তা হ'লে। তারপর কলওয়ালারা চালের চালান বন্ধ করতে বাধ্য হয়, লোকেদের কাছে জরিমানাও দেয়।"

"তাই করতে বল আমাদের?"

"ওতে কি আর এখন কাজ হয়? আমাদের লোকেরা ঐ ভাবে মাতলে, ইদিক সামলাবে কে বলুন? তবে স্পষ্টই বলতে হ'ল আপনাকে—চাল যেমন

যেমন শহরে মজুত ক'রে রেখেচে তেমনি দূরের পাড়াগাঁয়ের অনেক জায়গাতেও রেঁখেছে লুকিয়ে—গবর্মেণ্টের চোখেও ধূলো দিতে চায় ওরা ; সেই সব চাল নিয়ে আসতে হবে।"

"লুটে ?"

নরোত্তম একটু হাসিল, বলিল—"তারা আদর ক'রে তো গাড়িতে চাপিয়ে দেবে না বাবাঠাকুর···পণ্ডিতমশাই থাকলে যা করতেন তাই বললাম আপনাকে, অবিশ্যি আন্দাজে, তিনি তো বেঁচে নেই যে, পাকাপাকি বলব। তবে জন কতক লোকে জমা করচে, জোঁকের মতন দিন দিন ফুলচে, আর তার পাশেই হাজার হাজার লোক মরচে—এটা তিনি বুঝতে পারতেন না, সহ্য করতে তো পারতেনই না। আর সব কাজেই যে বুক চিতিয়ে মরতে হবে—এটাও তিনি জানতেন না। বলতে শুনেচি মরার কাজটা সব চেয়ে সহজ, সেটা একেবারে শেষের জন্যে রেখে দেওয়া উচিত—যখন বাঁচিয়ে চলবার আর কোন উপায় থাকবে না।"

টুলু গুঁড়ি ছাড়িয়া চঞ্চল ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, হাত দুইটা বুকের উপর জড়ো করিয়া পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল। জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, হেঁট করা মুখের উপর জ্যোৎস্না পড়িয়া বিচিত্র আলোছায়ার রেখা সৃষ্টি করিয়াছে ; মাঝে মাঝে ভ্রূ নাসিকা ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হইয়া রেখাগুলাকে চপল করিয়া তুলিতেছে। নরোত্তম কয়েকবারই আড়চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, টুলুর চঞ্চলতা যখন বেশ চরমে আসিয়া ঠেকিয়াছে মনে হইল, সেই রকম ধীরে ধীরে বলিল—"বলতাম না আপনাকে এসব কথা। সেদিন পণ্ডিতমশাইয়ের চিঠিটা আপনাকে দেবার আগে যে সব কথা শুনলাম আপনার মুখে—আমার ওপরই রাগ ক'রে বললেন—তাই থেকে মনে হ'ল, পণ্ডিতমশাই যা করতেন ব'লে আমার আন্দাজ সেটা আপনাকে বলা চলে। সেই শুনেই তাঁর অমন চিঠিটাও আপনাকে দিলাম আর কি।···এর মধ্যে যদি আপনার মত বদলে থাকে তার থেকে— যদি পণ্ডিতমশাইয়ের···"

টুলু দাঁড়াইয়া পড়িয়া নরোত্তমের মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া একটু যেন অন্যমনস্কভাবেই শুনিতেছিল কথাগুলা,—অন্যমনস্ক এইজন্য যে নরোত্তমের কলা-

কৌশল দেখিয়াও বিস্মিত হইয়া উঠিতেছিল—ঠিক সময়টিতে ফুঁ দিয়া বিধূমিত অগ্নিকে শিখায়িত করিবার কি চমৎকার কৌশল! পণ্ডিতমশাইয়ের নামটাই কতবার উচ্চারণ করিল!···মনের অন্য দিকে সঙ্গে সঙ্গে অন্য চিন্তার স্রোত চলিতেছে—সত্যই তো, কোথায় গেল মাস্টারমশাইয়ের সেই দ্বিতীয় চিঠির উন্মাদনা—পঞ্চকোটের সেই অগ্নি-সঙ্কেত, তাহার পরে অগ্নিদীক্ষা—মাস্টার-মশাইয়ের নিজের হাতের পিস্তল চাহিয়া লইয়া।···আগাইয়া গিয়া কাঁধে হাত দিয়া বলিল—"নরোত্তম, মত বদলাই নি, তোমার শুধু আন্দাজ—তিনি এই করতেন, আমি নিশ্চয় জানি, তিনি এই করতেন। তবে তার আগে ভেবে দেখতেন, অন্য কোন উপায় আছে কি না! সেইটুকু সময় আমায় দাও। বড় হঠাৎ দিলে না খবরটা?···আমি তোমায় কথা দিচ্ছি—যে চাল এরাই এই মাটি থেকে তুলেছে, এই জেলার মধ্যেই, সে চাল মজুত থাকতে আমি ওদের মরতে দোব না, অন্তত আমি বেঁচে থেকে ওদের মৃত্যু দেখব না।"

কথাটা রাত্রে চম্পাকেও বলিল।

বলিল—"চম্পা, সেদিনকার কথাগুলো বোধ হয় তোমার মনে আছে, সেই রক্ত দেওয়া-নেওয়ার কথা, যার জন্যে তোমার এখান থেকে স'রে যাওয়ার কথা ওঠে,—এই সব নতুন ব্যাপারে কথাটা চাপা প'ড়ে গেছল, কিন্তু আজ নরোত্তমের কথায় বুঝলাম, তার দরকারটা যায় নি, বরং তলে তলে একেবারে সামনে এসে পড়েছে।"

"তাতে আমায় সরিয়ে দেবার কথা নিশ্চয় আবার নতুন ক'রে উঠবে না?"

"না, তোমায় সরাবার কথা একেবারে তোমার ওপরই ছেড়ে দিয়েছি, যার মানে এই হয় যে, নিশ্চিন্ত আছি, তুমি ছেড়ে যাবে না। সেই জন্যেই তোমার কাছে কথাটা তুললাম তোমার পরামর্শের জন্যে, তুমি জীবনে মরণে নিতান্ত অচ্ছেদ্যভাবেই এখন আশ্রমের মানুষ ব'লে।"

নরোত্তমের সঙ্গে আজ সন্ধ্যার সমস্ত কথাবার্তা একটি একটি করিয়া বলিয়া গেল,

নিজের মন্তব্য দিয়া আরও বাড়াইয়া গবর্নমেণ্টের অন্যায়ের কথায়, জেলার কর্তাদের ধৃষ্টতার কথায় ক্রমে ক্রমে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে—যতবারই মাস্টারমশাইয়ের নামটা মুখে আসিতেছে উত্তেজনাটা যেন শিখায় জ্বলিয়া উঠিতেছে। চম্পা পিছনে যেমন হাত দিয়া দাঁড়ায়, দেয়ালে ঠেস দিয়া সেই ভাবে দাঁড়াইয়া স্থির অচঞ্চল দৃষ্টিতে সবটা শুনিয়া গেল, অন্তরে কি হইতেছে বাহিরে এক বিন্দু প্রকাশ হইতে দিল না।

শেষ হইলে খানিকটা স্থির ভাবেই চুপ করিয়া থাকার পর কিন্তু একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল, দৃষ্টিটা ধীরে ধীরে এদিক ওদিক ঘুরাইয়া বার দুয়েক টুলুর মুখের উপর রাখিল, যেন একটা কথা বলিতে চায় অথচ মনস্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাহার পর এক সময় বলিল—"আমার মুশকিল যে কিছু বলতে গেলেই মনে করবেন, বারণ করছি ; তা না মনে ক'রে যদি একটু বিশ্বাস করেন যে, আপনাদের পথে বাধা আমি জীবনে দোব না, যে পথই ধরুন তাতে একটুকুও কাঁটা দেখলে তুলে ফেলবার জন্যেই থেকে গেছি এখানে, তবেই আমার যেটুকু মনে হচ্ছে বলি।"

"আমার সে বিশ্বাস অনেকদিন থেকেই আছে চম্পা, হতে পারে মনের বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে কথা অনেক সময় হয়তো বলতে পারি নি। তুমি বল।"

"আপনারা দুজনেই বড্ড উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন, আপনাদের পুরুষের মন— অন্যায়টাও ওদিকে বড্ড বেশি ; কিন্তু রাগের জন্যেই একটা ছোট্ট কথা আপনাদের নজর এড়িয়ে গেছে ব'লে মনে হয়।"

"কি সেটা ?"

"লুটের চাল ঘরে তোলবার সঙ্গে সঙ্গে ধরা প'ড়ে যেতে হবে…"

"সমস্ত দেশে দুর্ভিক্ষ, কারা নিয়ে গেল, কোথায় নিয়ে গেল, কি ক'রে টের পাবে ?"

"যারা মরছে দুর্ভিক্ষে, তাদের বিশ-ত্রিশ বোরা চাল সরিয়ে ফেলার ক্ষমতাও নেই, ক্ষমতা থাকলেও জায়গা নেই। গবর্মেণ্টের নজর সহজেই গিয়ে পড়বে

যেখানে যেখানে অন্নসত্র খোলা হয়েছে সেইখানে, একটা মস্ত বড় সন্দেহ হবে, চাল চারিদিক দিয়ে বন্ধ করছি অথচ পাচ্ছে কোথা থেকে…”

“বেশ, তাই যদি হয় তো শান্ত নিরুপদ্রব আশ্রম ব'লে আমাদের আশ্রমের বরাবরই সুনাম আছে, এদিকে নজর না পড়বারই কথা।”

“কিন্তু পড়তেও পারে, আর অন্য জায়গা থেকে আমাদের বিপদ সেইখানেই বেশি।”

“কেন ?”

“আপনি মাস্টারমশাইয়ের শেষ চিঠির কথাটা ভুলে যাচ্ছেন বোধ হয় ; অন্য অন্য যে সব জায়গা সে সব শুধু দুর্ভিক্ষের জন্যে, দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে যাবে। আমাদের আশ্রমের আসল কাজ অনেক দূরে—দুর্ভিক্ষ হঠাৎ একটা বোঝা হয়ে এসে পড়েছে মাত্র। শান্ত নিরুপদ্রব ব'লে আমাদের শান্তি-আশ্রমের যে যশ আছে, সেই বড় কাজের জন্য সেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সরকারের চোখে ধূলো দেওয়া আর কি। এটা গেলে তো আশ্রমের সব গেল।”

টুলুর উত্তেজিত দৃষ্টিটা শুধু নরম হইয়াই আসে নাই, অন্তরে প্রসন্নতায় স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে। চুপ করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল, তাহার পর নিরুপায় করুণ কণ্ঠে বলিল—“কি করা যায় চম্পা ? মনে হচ্ছে, বলছ যেন ঠিক।…কি করি ? গায়ের বড্ড জ্বালা ধরে। মনে হয়, তাড়াতাড়ি একটু কিছু ক'রে সেই জ্বালার খানিকটা ওদিকেও ঢেলে দিই।”

চম্পা চিন্তিতই ছিল, বলিল—“আমার কি মনে হয় জানেন ? শান্ত নিরুপদ্রব ব'লে যে সুনামটা আছে, সেইটে ভাঙিয়েই একটু চেষ্টা করা ভাল আগে। সরকারকেই ধরুন—আমাদের চাল দাও। সবাই যখন হুমকি দিয়ে চাইছে, সেই সময় ভিক্ষে ক'রে চাইলে চাই কি যশটাও আমাদের বেড়ে যেতে পারে সরকারের কাছে। এক সঙ্গে দুটো কাজ হয়।”

কথাগুলা বড় গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে। টুলুর দৃষ্টির সঞ্চীয়মান প্রশংসাতে চম্পা ভিতরে ভিতরে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল—শেষের কথাটিতে একটু হাসিয়া

বলিল—"কি জানি হয়তো ভাবছেন, চম্পাও দিব্যি বোড়ের চাল দিতে শিখেছে। তা নয়, মনে এই রকম হচ্ছে আমার। সার কতটুকু কি জানি ?"

টুলু অন্যমনস্ক ভাবেই একটু হাসিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল—"যদি তাতেও না দেয় চাল ?"

চম্পা সেই হাসিটুকুই একটু অন্যরকম করিয়া বলিল—"চিরদিনই যে নিজেদের আসল রূপ লুকিয়ে রাখতে হবে বা সেটা সম্ভব, এমন কথা তো বলেন নি মাস্টারমশাই।"

১১

তিন দিন পরের কথা। টুলু আশ্রমের ছই-ওলা বলদ-গাড়িতে মহকুমা হইতে ফিরিতেছিল।

জ্যোৎস্না রাত্রি, বোধ হয় ত্রয়োদশী কি চতুর্দশী তিথি হইবে, নির্মেঘ আকাশে প্রায় পরিপূর্ণ চাঁদ, উঁচু-নিচু কাঁকুরে পথ দিয়া গাড়িটা মন্থর গতিতে চলিয়াছে, বলদ দুইটা এক-একবার গাড়োয়ানের হাতে ল্যাজ-মলা খাইয়া দশ-বিশ পা ছুটিয়া যাইতে খানিকটা দোলানি লাগিতেছে। টুলু একবার বলিল—"গিরিধারী, আস্তেই যেতে দাও—যেমন যাচ্ছে ; কতক্ষণ লাগবে পৌঁছুতে ?"

"ওদের ধম্মের ওপর ছেড়ে দিলে রাত কাবার ক'রে ছাড়বে না ?—তেমন বাপের সুপুত্তুর বলদ মনে করেচেন ?"

"তা হোক, রাস্তা খারাপ, তায় চড়াই-ওৎরাই রয়েছে। এ বরং একটু ঘুমুতে পাব।"

আসলে তা নয়, এই মন্থরতাটুকু চমৎকার লাগিতেছে, আরও একটা কি লাগিতেছে চমৎকার—কাল থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাগুলার মধ্যে সেটাকে বেশ স্পষ্টভাবে ধরা যাইতেছে না। ঠিক ধরা যাইতেছে না বলাও ভুল—সেটা আসিয়া পড়িতেছে মাঝে মাঝে একেবারে মন ঘেঁষিয়া, টুলুই যেন

তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছে। এ ধরনের লুকাচুরি জীবনে তাহার এই নূতন, কিংবা হয়তো কোন বসন্তপ্রভাবে আসিয়া থাকিবে কখনও, কোনও দূর অতীতে, আজ আর পড়ে না মনে।

পরশু রাত্রেই টুলু সাগরদহের আশ্রম থেকে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, মোটে পাঁচ দিনের চাল হাতে, নষ্ট করিবার মত সময় কোথায়? নরোত্তমকে না পাঠাইয়া নিজেই বাহির হইল, হয়তো চালের পারমিটের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত পৌঁছিতে হইবে, নরোত্তম সুবিধা করিতে পারিবে না। তাহার বরং এখানেই বেশি দরকার।...সবার ওপরের কথা টুলুর ইচ্ছা করিতেছে নিজেই শক্ত কাজটা বাছিয়া লইতে।

কিন্তু থাকা হইবে কোথায়?

নরোত্তমের সারা জেলাটারই সব যেন নখদর্পণে, বলিল—"হোটেল আছে ওখানে অনেক—কোর্ট-কাছারির জায়গা তো?...আপনি কিন্তু থাকবেন গিয়ে মুরলীধরের হোটেলে। বাবাঠাকুর উড়ে-বামুন, ভাল লোক; বরং আমার নাম করবেন।"

চম্পা বলিল—"কেন, তটিনীদিদি তো রয়েছেন, মনে ছিল না আপনার?"

টুলু উত্তর করিল—"মনে থাকা...হ্যাঁ, সেখানই তো রয়েছে...। তবে না-বলাকওয়া...হুট ক'রে গিয়ে ওঠা...মেয়েছেলে...হয়তো একাই রয়েছে..."

চম্পা দাঁতে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে শুনিতেছিল, বলিল—"কি হয়েছে তাতে? আর আপনি তো দিনে দিনে কাজ সেরে দিনে দিনেই বেরিয়ে পড়বেন।...না, সেইখানেই উঠবেন, একটু ভদ্রভাবে থাকতেও তো হবে। আর খুব আনন্দ হবে তাঁর।"

তাহাই শেষ পর্যন্ত ঠিক করিয়া বাহির হইলেও, রাস্তায় নানারকম ভাবিয়া চিন্তিয়া হোটেলে ওঠাই স্থির করিল টুলু। বরং ফিরিবার সময় খোঁজ লইয়া দেখা করিয়া আসিবে যদি তেমন মনে হয়—কেন না, আশ্রমে আসিলে দুঃখও করিতে পারে তটিনী। মোটের উপর অনিশ্চিতই রহিল ওটুকু।

আশ্রম ছাড়িয়া বাহির হইতে অনেক রাত হইয়া গিয়াছিল, বেলা যখন প্রায় দশটা, তখনও উহারা শহর থেকে মাইল দুয়েকের পথে।

সামনে খানিকটা দূরে একটি ছেলে সাইকেলে করিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ নামিয়া পড়িয়া পিছনের চাকাটার পানে চাহিয়া হতাশভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল, তাহার পর নিরুপায়ভাবে একবার সামনে-পিছনে চাহিয়া সাইকেল হাতে করিয়া চলিতে লাগিল।

মাথার উপরে চনচনে রোদ, কাঁকুরে জমি তাতিয়া উঠিয়াছে, গিরিধারীকে একটু জোরে চালাইতে আদেশ করিতে গাড়িটা পাশে আসিয়া পড়িল। টুলু প্রশ্ন করিল—"সাইকেলের টিউবটা বুঝি পাংচার হয়ে গেল?"

ছেলেটি অপ্রতিভভাবে একটু হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ…দেখুন না, মাঝরাস্তায়…"

"শহরেই যাবেন?"

"হ্যাঁ।"

"বলদ-গাড়িতে আপত্তি না থাকে তো আসুন না, ওদিকেই যাচ্ছি।"

"আর এই বোঝা?"—প্রশ্নটা করিয়া ছেলেটি আবার লজ্জিতভাবে একটু হাসিল।

টুলু গিরিধারীকে প্রশ্ন করিল—"ছইয়ের ওপর বেঁধে-ছেঁদে নিতে পারবে না তুমি সাইকেলটা?"

সেই ব্যবস্থাই হইল। ছেলেটি আসিয়া গাড়িতে বসিল।

পনেরো-ষোলো বছর বয়স হইবে। রোদে মুখটা রাঙিয়া উঠিয়াছে, একটু বোধ হয় লাজুকপ্রকৃতির, মুখটা বাহিরের দিকে ঘুরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

খানিকটা গিয়া টুলু আবার প্রশ্ন করিল—"এখানেই বাড়ি?"

ছেলেটি মুখ ঘুরাইয়া উত্তর করিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ…ঠিক বাড়ি বলা যায় না…"

এই পর্যন্ত বলিয়া স্থিরভাবে মুখের পানে সেকেণ্ড কয়েক চাহিয়া রহিল।

দৃষ্টিতে কৌতূহল লক্ষ্য করিয়া টুলু একটু হাসিয়া বলিল—"কি দেখছ যেন মুখের পানে চেয়ে; কোথাও…"

সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের দৃষ্টিতেই কৌতূহল ফুটিয়া উঠিল, পাল্টাইয়া প্রশ্ন করিল—"তোমার বোন এখানে মেয়ে-স্কুলের মিস্ট্রেস্, না ?"

ছেলেটি খুশী হইয়া উঠিল, একটু হাসিয়া বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ; আপনি গঞ্জডিহিতে ছিলেন—হেডমাস্টারমশাইয়ের বাসায়…"

"হ্যাঁ।"—বলিয়া টুলু এমনভাবে মুখটা ঘুরাইয়া লইল যেন খুশী হওয়া দূরে থাকুক, একটু বিব্রত হইয়াই পড়িয়াছে। ছেলেটি লাজুকই, এই ভাবান্তরে যেন একটু হতবুদ্ধি হইয়াই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আর কোন কথাই হইল না, দুজনে দুজনের চিন্তা লইয়া দুই দিকে মুখ ফিরাইয়া বাকি পথটা কাটাইল।

শহরের মধ্যে খানিকটা আসিয়া ছেলেটি বলিল—"এইবার নামব, ঐ আমাদের বাসা, ঐটে স্কুল। · আপনি কোথায় নামবেন?"

খুব অস্বস্তিকর একটা অবস্থা, টুলু শেষের প্রশ্নটা এড়াইয়া বলিল—"ও, এইটে স্কুল ?…বেশ ছোটখাট বাড়িটি…এইখানেই নামবে ?"

"হ্যাঁ, আপনি কোথায় নামবেন ?"

"একটু এগিয়েই…কাছারিতে কাজ আছে একটু।"

"কোথায় থাকবেন ?…আমাদের এখানেই চলুন না।"

"আমি কাজ সেরেই তাড়াতাড়ি ফিরে যাব।"

"নাইতে খেতে তো হবে।…নামুন এখানেই।"

ছেলেমানুষি জিদে মুখে একটু হাসি লাগিয়া আছে। উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিল—"চলুন…দিদি বড্ড খুশী হবেন, না হ'লে এমন রাগ করবেন আমার ওপর !"

"ব'লো, ফেরবার সময় করবই তো।"

"সে হয় না।…ততক্ষণ কে তাঁর বকুনি সামলাবে ?"

নিজে নামিয়া গিয়াছে, একটু স্পষ্টভাবেই কথাটা বলিয়া, আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া গাড়োয়ানকে বলিল—"গেটের মধ্যে দিয়ে ভেতরে চলো।"

ব্যবস্থাটা পাকা করিয়া নিজে একরকম ছুটিয়াই বাসার দিকে চলিয়া গেল।

পরিপূর্ণ জোৎস্নার মধ্য দিয়া জনহীন পথে গাড়িটা মন্থরগতিতে আগাইয়া চলিয়াছে। পরশু থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার মনে মনে পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে টুলু এইখানে আসিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। মনটাকে অন্য চিন্তার দিকে ঘুরাইল—আশ্রমে হঠাৎ সেই মূর্ত দুর্ভিক্ষের বন্যা···ফ্যানের নালার ধারে দুইটা মৃতদেহ···টানা উনানের সামনে চম্পা রাঁধিতেছে—গাছ-কোমর করিয়া শাড়িটা জড়ানো—চম্পা, তাহার শিষ্যা···মাস্টারমশাইয়ের সেই চিঠি—একটা মেয়ে যদি সুধরে যায় তো একটা জাতি সুধরে যেতে পারে···আরও উঠুক চম্পা—উর্ধ্বে অনন্তে, মাস্টারমশাই ওপর থেকে আশীর্বাদ করুন টুলুর প্রিয় শিষ্যাকে···

এত করিয়াও মনটা কখন্ আবার তটিনীর বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছে। ভাই গিয়া আগেভাগে খবর দেওয়ায় তটিনী ভিতর থেকে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন কাজে ব্যস্ত ছিল—মনে হইল যেন রান্নাই, কপালের চুলগুলা ভিজা ভিজা, মুখটা একটু রাঙা। একমুখ হাসিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—"আপনি!···হঠাৎ কানন বলতে বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না।···তার ওপর আবার বললে আপনি নামতে চাইছিলেন না···"

বারান্দায় উঠিতে উঠিতে টুলু হাসিয়া বলিল—"খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নালিশও হয়েছে?"

"নালিশের কি দোষ বলুন? এখানে এসে···"

"দোষ নয়, রাগিয়ে দিলে অভ্যর্থনাটা কি রকম হবে তাই বলছি।"

তটিনীর পিছনে পিছনে ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবে, গিরিধারী বারান্দার

নিচে আসিয়া প্রশ্ন করিল—"হোটেলে তা হ'লে উঠবেন না দাদাঠাকুর এখেনেই···?"

তটিনী ঘুরিয়া চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলিল—"অবাক করলেন! রাগের আর কি দোষ বলুন? হোটেলে উঠতে যাচ্ছিলেন! আমি বলি, কেউ বুঝি আত্মীয়কুটুম্ব আছে।"

গাড়োয়ানটাকে বলিল—"না, তুমি বলদ খুলে জল-টল খাওয়াও।"

ঘরের মধ্যে আসিয়া তিনজনে বসিল। বাসাটা ছোট, কিন্তু বেশ তরতরে ঝরঝরে। ঘরগুলির জানলা-দোরে পরদা, বসিবার ঘরের আসবাব সামান্য হইলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সাদা লংক্লথ দিয়া ঢাকা, বারান্দায় গুটিকতক ফুলগাছের আর পাতাবাহারের টব, বেশ একটি স্নিগ্ধ পরিবেশ।

টুলু আসিবার কারণটা বলিল, সাগরদহের অবস্থাটা বর্ণনা করিল—ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, তাহার পর দক্ষিণ থেকে আর্ত বুভুক্ষুদের দল···

তটিনী গম্ভীরভাবে এক নিশ্বাসেই সবটা শুনিয়া গেল, তাহার পর বলিল—"চাল কিন্তু পাবেন না তো।"

"খুব যে আশা ক'রে এসেছি তা নয়, তবু একবার চেষ্টা করতে তো হবে, ভাবছি, খোদ সাব-ডিভিশনাল অফিসারের সঙ্গেই দেখা করব একবার।"

"সেটা চাল পাওয়ার চেয়েও অসম্ভব।"

কি একটু ভাবিল, তাহার পর সমস্ত ব্যাপারটাই মন থেকে যেন নামাইয়া দিয়া বলিল—"আচ্ছা, সে হবে 'খন। আগে উঠুন, স্নান-টান সেরে নিন, সমস্ত রাত্রি নিশ্চয় ঘুম হয় নি।"

ও প্রসঙ্গটাই চাপা দিয়া দিল। স্নানাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য কাননকে রাখিয়া চলিয়া গেল। টুলু প্রস্তুত হইলে রেকাবিতে জলখাবার সাজাইয়া আনিয়া গল্প জুড়িয়া দিল—চম্পা কেমন আছে—আর হীরা—প্রায় মনে পড়ে হীরার কথা—মাত্র একবার, তাও ঐটুকুর জন্য দেখিয়াছে তো?—কিন্তু কি ক্ষমতা আছে, যেন মায়ায় জড়াইয়া ফেলিয়াছে তটিনীকে। টুলু হয়তো বলিবে, কোথায় আর

গেলেন হীরকে দেখিতে! ছুটিতে কানন আসিয়া পড়িল যে, তবুও ভাবিয়াছিল যে কাননকে লইয়াই একবার যাইবে। এমন সময় আসিয়া পড়িল ঝড়…

ঝড়ের কথাটা আনিয়া ফেলিয়া তটিনী সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গটা বদলাইয়া ফেলিল—বেশ সহজ কৌশলের সঙ্গেই করিল এটুকু—এই প্রলয় ঝঞ্ঝার গায়েই আনিয়া ফেলিল গঙ্গাডিহির সেই ঝড়ের বিকালটি, যাহার সমস্ত বিক্ষোভটুকু মুছিয়া গেছে, আছে শুধু একটা মিষ্ট স্মৃতি মনের কোণে লাগিয়া… টুলু আবার সেই রকম একটি স্কুল গঠন করুক না সাগরদহে—এবার সাগরদহ দেখিয়া আসা অবধি তটিনীর ভয়ানক ইচ্ছা হইয়াছে—খুব বড় প্ল্যান তটিনীর, সবাই মিলিয়া স্কুল চালাইবে—রতনকে রাজি করিয়াছে, চিঠি লিখিয়া সে বি. এ পাস করিয়া সাগরদহে গিয়া উঠিবে একেবারে—কাননও রাজি…

"নয় কানন?—আমাদের হয় না এই সব কথা ব'সে ব'সে?"

কানন টুলুর পানে চাহিয়া বলিল—"ফুরসৎ পেলেই দিদির ঐ কথা—কী যে দেখে এসেছেন সাগরদহে…"

টুলু তটিনীর মুখের উপর কৃতজ্ঞ দৃষ্টি তুলিয়া বলিল—"আপনি আমার চেয়ে এত বেশি ভাবেন সাগরদহের কথা!…"

তটিনী উত্তর দিল কাননের দিকে চাহিয়া—"না ভেবে যেন উপায় আছে!—একবার চল না কানন এই ছুটিতেই—ঝড়ের ব্যাপারটা একটু জুড়িয়ে আসুক—কী চমৎকার সে জায়গা, কি বলব তোমায়! নদীর ধার, যে দিকে চাও—সবুজ আর সবুজ; আমাদের সাঁকরেলের ওদিকের মতন নয়··এই! কানন এবার আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে…জানেন? সাঁকরেলের নিন্দে কাননের সামনে করবার জো নেই—আমি বলি, যেটা ভাল সেটাকে ভাল বলব না?…ওকে কি ব'লে এর ওপর চটিয়ে তুলি বলুন তো?"

তটিনী হঠাৎ একটু লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া গেল, কানন টুলুর দিকে চাহিয়া বলিল—"বলে, তোমার সাঁকরেলের দিদির চেয়ে তোমার সাগরদহের বউদিদিটি পর্যন্ত ঢের ভাল, গিয়ে বরং মিলিয়ে দেখো…"

তটিনী টুলুর দিকে চাহিয়াই হাসিয়া বলিল—"চটলে ওর মনের কথাটা বেরিয়ে পড়ে, বলে—আমার সাঁকরেলের দিদিকে কবে বলেছি আমি ভাল ?···

কথাগুলি একটি একটি করিয়া মনে পড়িতেছে টুলুর, অন্যমনস্ক হইবার করিতেছে চেষ্টা, যেন উলটা পথে তটিনীর ভঙ্গিটুকু হাসিটুকু পর্যন্ত আসিয়া পড়িতেছে।

এই নির্জনতা তটিনী দিয়া যেন কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া যাইতেছে, এই জ্যোৎস্নাপ্লুত রজনীতে মেয়েটিকে বড় রহস্যময়ী বলিয়া মনে হইতেছে—যখন গম্ভীর থাকে, যেন থমথম করিতে থাকে, তাহার পর এ কথা সে কথার মধ্যেই ওর গাম্ভীর্য কখন যায় কাটিয়া, মুখরতায় যেন ছলছল করিয়া ওঠে—তিনবার দেখিল তিনবারই এইরকম—অথচ ওর তরলতার নিচেও থাকে চিন্তা, গাম্ভীর্য—মনটা কর্তব্যের দিকে থাকে সজাগ। টুলু বুঝিয়াছিল, এই যে ঝড়ের কথা, টুলুর আসিবার উদ্দেশ্যের কথা চাপা দিয়া নিতান্তই অবান্তর কথা সব আনিয়া ফেলিতেছিল তটিনী, তাহার একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল—অতিথির মনটাকে বেদনা থেকে একটু মুক্ত করিয়া রাখা—যেন মনে মনে বলা—এখানে যতটুকু আছেন একটু ভুলে থাকুন তো···

আহারের সময়েও এই সব গল্পই—নায়ক হইল বেশি করিয়া হীরা—তাহার রূপ, তাহার ভঙ্গি, তাহার কথা। টুলু একটু লজ্জিতভাবে তাহার কীর্তি-কলাপেরও কতক কতক বর্ণনা করিল। ভাই-বোন দুজনেই অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিল,—কী ভাবে গড়িয়া তুলিবে টুলু তাহার ছেলেকে ?—এসব নূতন জগৎ গড়িবার ছেলে—আর এই স্কুল-কলেজের ধরা-বাঁধা পথে নয়···

আহারের পর তটিনী জোর করিয়াই একটু নিদ্রা যাওয়াইল টুলুকে। কিশোরীর মত ওর সমস্ত আনন্দ-কাকলির মধ্যে যে চিন্তার স্রোত বহিতেছিল টুলু সেটা টের পাইল জাগিয়া উঠিয়া। তটিনী বলিল—"ভেবে-চিন্তে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা হবার একটা উপায় ঠাউরেছি। চলুন, দেখি যদি হয়।"

১২

টুলুকে লইয়া তটিনী গেল তাহার স্কুলের সেক্রেটারির কাছে।

সৌম্যকান্তি বৃদ্ধ, এখানকার একজন বড় ব্যবহারজীবী, শহরে যথেষ্ট প্রতিপত্তি।...তটিনী পরিচয় করাইয়া দিল টুলুর—তাহার নিজের সঙ্গে কি করিয়া জানাশোনা, গঞ্জডিহিতে কি লইয়া ছিল, এখন কি লইয়া আছে। একটা জিনিস বড় ভাল লাগিল টুলুর—একজন অনাত্মীয় পুরুষকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে; কোন মিথ্যা আত্মীয়তা আরোপ করিল না, একটি কথা সামলাইয়া বলিল না; স্বচ্ছ সত্যটি বৃদ্ধের কাছে ধরিয়া দিল।

পরে যাহা বলিবার টুলুই বলিল, বৃদ্ধ সব শুনিয়া গেলেন, প্রশ্নাদি খুব বেশি করিলেন না, মুখের দিকে যেন একটু বেশি চাহিয়া থাকিয়া শুনিলেন সবটা, মুখে প্রশংসার একটি শান্ত মৃদু হাস্য ফুটিয়া রহিল। শেষ হইলে তটিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দেখা করতে চায় না মা, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যে কত গলদ তুমি তো জানো; তবু আমি দেখাটা করিয়ে দোব, চিঠি না দিয়ে নিজেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব, কিন্তু কাজ কতদূর হবে বলতে পারি না তো।"

টুলু বলিল—"আমাদের আশ্রমের একটা সুনাম আছে গবর্মেণ্টে, সেই ভরসায়..."

বৃদ্ধের মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিলেন—"কিন্তু সুনাম আর রাখতে পারছেন কোথায়? দুশো লোককে খাওয়াচ্ছেন—ভগবান পর্যন্ত যাদের অপ-রাধের জন্যে গবর্মেণ্টের হয়ে সাজা দিচ্ছেন। চালের বদলে লোকগুলোকে ঠেঙিয়ে মারবার জন্যে লাঠি চাইতে আসতেন, সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যেতেন, কাজের সুবিধের জন্যে লাঠির বদলে বোধ হয় বন্দুক জুগিয়ে দিত।... উঃ, কি অত্যাচার! কলকাতার কাগজে এখনও খবরগুলো ছাপতে পর্যন্ত দেয় নি!..."

মুখটা একটু ঘুরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

দেরি হইল আবার প্রকৃতিস্থ হইতে, তাহার পর আবার আগেকার মত শান্ত কণ্ঠে বলিলেন—"বেশ, আজ গেছে কোথায় এন্‌কোয়ারিতে, কাল সকালে আমি একটু ব্যস্ত থাকব, বিকেলে আপনি আসবেন।"

তটিনীর পানে চাহিয়া বলিলেন—"চেষ্টা আমি করব যথাসাধ্য মা, কিন্তু কী যে অবস্থা হয়েছে, কী যে হবে!···"

গাড়ি অলস গতিতে চলিয়াছে। বলদ দুটাকে তাড়না করিতে না পারায় গিরিধারী বোধ হয় একটু অপ্রসন্ন।

কাল এতক্ষণ কী করিতেছে টুলু?···প্রশ্নটা মনে উঠিতেই টুলু মনটাকে আবার অন্য প্রসঙ্গে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল—চম্পার কথা, হীরকের কথা, দুর্গতদের কথা, এখন দুইটা আহারের ব্যবস্থা হইতেছে—না পাওয়া যায় চাল, একটা আহার বরাদ্দ করিতে হইবে—বিকালে—যতদিন যায় টানিয়া-বুনিয়া, উপায় কি?···কখন যেন নিঃসাড়ে মনটা আবার তটিনীর বাসায় আসিয়া গেছে···কাল এতক্ষণ বাসার সামনে খোলা জায়গাটুকুতে তিনটি চেয়ারে তাহারা তিনজনে বসিয়া। এই রকম জ্যোৎস্না, বারান্দার টবে কয়েকটি রজনীগন্ধার স্তবক—মৃদুগন্ধ জ্যোৎস্নার সঙ্গে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, প্রথমে শুধু কাননই ছিল, তাহার পর তটিনী আসিল রান্না শেষ করিয়া।···কী যে একটা অপরূপ আস্বাদ এই সময়ের রাত্রিটিতে, টুলুর মনটা ক্রমাগতই তন্দ্রালস গতিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐখানটিতে আসিয়া পড়িতে লাগিল। এ যেন এক অনাবিষ্কৃত জগতের একটি ক্ষীণ তটরেখা, সামনে এতটুকু আভাস—বাকিটা শুধুই স্বপ্ন আর স্বপ্ন।

সকালে কাননের সঙ্গে ছোট শহরটুকু ঘুরিয়া আসিল। এদিকেও ঝড় বেশই হইয়াছে, গাছ উপড়াইয়া পড়িয়াছে, কয়েকটা চালা-বাড়িও পড়িয়াছে কিছু কিছু, তবে লোক কিংবা গরু-বাছুর নষ্ট হয় নাই। দুর্গতরাও আসিয়াছিল দলে দলে, ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমেই তাহাদের ধরিয়া ধরিয়া লরিতে করিয়া দূরে দূরে ছাড়িয়া

আসা হইয়াছে—শহরের হাওয়া ঠিক রাখিবার জন্য। অন্নসত্র খোলা মানা, তবে কিছু দুর্গত লুকাইয়া থাকিয়াই গেছে শহরের মধ্যে, প্রায় সব গৃহস্থই অবস্থানুযায়ী দুজন, পাঁচজন, দশজন বা তাহারও অধিক লোকের ভার লইয়াছে। টুলুর মুখে প্রশ্নটা বাহির হইয়া গেল—"তোমার দিদিও রেখেছেন নাকি কিছু ?"

কানন লজ্জিতভাবে শুধু একটু হাসিল প্রথমটা, তাহার পর টুলু উত্তরের প্রত্যাশায় চাহিয়া আছে দেখিয়া বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল তাই চালের সন্ধানে বেরিয়েছিলাম।"

কৌতূহলটা ঠিক শোভন হইতেছে কি না ভাবিয়া না দেখিয়াই টুলু ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল—"কজন আছে ? কোথায় আছে তারা ? দেখলাম না যে ?"

"আছে স্কুলে, স্কুল পূজোয় তো বন্ধ এখন···"

"কজন ?"

এবার অন্য প্রশ্ন না থাকায় কানন উত্তরটা আর এড়াইতে পারিল না, একটু অনিচ্ছার হাসি হাসিয়া বলিল—"জন দশেক হবে বোধ হয়।···দিদি কিন্তু চান না কেউ জানে···"

"কেন ? ম্যাজিস্ট্রেটের···?"

"না, সে নয়; গেরস্ত যদি নিজের বাড়িতে রাখে—রাস্তায় ঘোরাঘুরি না করে, ম্যাজিস্ট্রেটের আপত্তি কি থাকতে পারে ? দিদি চান না, তার কারণ···"

একটু হাসিয়া মুখ তুলিয়া বলিল—"জানেনই তো দিদিকে।"

বিকালে সেক্রেটারির সঙ্গে গিয়া টুলু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা করিল।

সাহেব পদগৌরবে, এ দেশী লোকই। সেক্রেটারি পরিচয় দিয়া দিলে টুলুর কাছে সব শুনিয়া একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"তা এসব বাই কেন ? আজকাল নিজেরই জুটছে না লোকের···দেশসেবা ?"

চাহনিতেই একটা তীক্ষ্ণ কিছু ছিল, যাহার জন্য টুলু সাবধান হইয়া গেল,

বলিল—"দেশসেবা যে নয়, এ কথা বললে মিথ্যে বলা হবে ; তবে আজকাল দেশসেবার নামে যা হচ্ছে চারিদিকে তা যে নয়, এটুকু জোর ক'রে বলতে পারি আপনাকে। ইন্সট্যুশনটা কাছাকাছি কয়েকখানা গ্রামের সহানুভূতির ওপর নির্ভর করে ; লোকগুলোকে ফিরিয়ে দিলে সেটা হারাতে হয়, তা নইলে সত্যিই আমাদের না আছে সময়, না আছে সামর্থ্য এসব উপদ্রব ঘাড়ে করবার।"

স্থিরভাবে শুনিতেছিলেন, প্রশ্ন করিলেন—"আগস্টের রেকর্ড কি ?—রাস্তা কাটা, টেলিগ্রাফ ছেঁড়া···"

টুলু বলিল—"সেটা আমার মুখে শুনবেন কি, তখনকার থানায় এন্‌কোয়ারি ক'রে জানবেন।···আগস্টে লোকদের কাছে আমাদের বদনাম হয়েছে ব'লেই আমাদের এই হ্যাপাটা ঘাড়ে করতে হ'ল।"

"নামটা কি বললেন ?"

"শান্তি-আশ্রম।"

ম্যাজিস্ট্রেট সেক্রেটারির পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"বরং অশান্তি আশ্রম নাম হ'লে তার স্বরূপটা স্পষ্ট বোঝা যায়, এ যে···"

টুলুও হাসিল, বলিল—"অশান্তি-আশ্রম নাম দিয়ে আগস্ট আন্দোলনে যদি এই রকম কুটোটিও না নেড়ে ব'সে থাকতাম তো ওদের হাতে আমাদের দশাটা কি হ'ত সেটাও একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করি স্যার।"

সেক্রেটারি হাসিলেন, ম্যাজিস্ট্রেটও অল্প অল্প যোগ দিলেন, বলিলেন—"খাঁটি হয় তবে তো, সেই কথাই বলছি। শান্তি খাঁটি হ'লে আমরাও তো বাঁচি।"

একটি ডি. ও. চিঠির কাগজ টানিয়া লইয়া খস্‌খস্‌ করিয়া কি লিখিয়া খামে ভরিয়া ঠিকানাটা লিখিয়া দিলেন, কলিং বেল টিপিতে আরদালি আসিয়া দাঁড়াইল, বলিলেন—"সীল ক'রে দাও।"

চিঠিটা টুলুদের ওদিককার থানার দারোগার নামে।

বারান্দা থেকে নামিয়া খানিকটা আগাইয়া আসিয়া সেক্রেটারি টুলুর পিঠে

দুইটা সাবাসির মৃদু আঘাত দিয়া বলিলেন—"বাঃ, দিব্যি !···কিন্তু থামের মধ্যে যে চাল আছেই এটা ধ'রে নেবেন না।"

টুলু প্রশ্ন করিলে—"কেন ?"

"অবশ্যি থাকতেও পারে, তবে ফাঁকিও থাকে, এদের আর মনুষ্যত্ব নেই।"

টুলু হঠাৎ মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া কি একটু ভাবিল, তাহার পর সেক্রেটারিকে একটু অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া আবার উঠিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল, বলিল—"একটু মাফ করবেন স্যার, একটা কথা বলতে এলাম, লোকগুলোকে সরিয়ে দেবারই চেষ্টা করব, তা হ'লে আর আপনার দয়ার সুযোগ নেবার দরকার হবে না। গবর্মেণ্টের নিজের কত দরকার চালের দেখছি তো—এই যুদ্ধের বাজারে।"

ম্যাজিস্ট্রেট একটু লঘুভাবে হাসিয়া বলিলেন—"and goverment would be grateful (গবর্নমেণ্ট এর জন্যে কৃতজ্ঞ থাকবেন)।"

চিঠিটা পকেটে রহিয়াছে টুলুর। হাতটা গিয়া আবার খামটার উপর পড়িল, অনেকবারই পড়িয়াছে, কড়া খাম, গালার উপর সীলমোহরের কড়া পাহারা। কি রহস্য আগাইয়া চলিয়াছে ? টুলুর মুখটা কঠিন হইয়া ওঠে, তবে সেও প্রস্তুত, তাহার জন্যই শেষে এটুকু গাহিয়া আসিল।

কিন্তু মনের কাঠিন্য আজ টিকিতেছে না যেন। কাল থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাগুলির মধ্যে কোথাও এমন কিছু যেন লুকাইয়া আছে যাহা নিজের উত্তাপে জীবনের সব কঠিনতাই গলাইয়া জীবনকে সহজ সরল স্বচ্ছন্দ করিবার ক্ষমতা রাখে···

কী যে সেটা টুলুর মন যেন বুঝিতে পারে না।

আসলে তাহাও নয়; সন্ন্যাসী টুলুর মন স্বীকার করিতে চায় না বুঝিতে পারাটাকে, তাই প্রতিপদেই তটিনীর চিন্তাটাকে প্রাণপণে ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

চারিদিক নিঃশব্দ। কাঁকরের রাস্তার গায়ে শ্লথ-গতি চাকার ঘর্ষণে ভরা

জ্যোৎস্নার গায়ে একটা অতি ক্ষীণ শব্দ-তরঙ্গ তুলিতেছে। রাত্রি হইয়া উঠিয়াছে। গভীর চিন্তার মোহেই হোক, কিংবা চিন্তাটাকে রুখিয়া রাখিবার পরিশ্রমেই হোক, চোখে তন্দ্রা আসিতেছে নামিয়া, টুলুর আচ্ছন্ন চেতনায় মনে হইতেছে, জীবন শুধু এই জটিল সমস্যা আর বিরোধ-বিক্ষোভের আগুনের মাঝখানে বসিয়া বৈরাগীর তপস্যাই নয়, আরও যেন কিছু কোথায় লুকাইয়া আছে; তন্দ্রার মধ্যে তাহারই সন্ধানে মনটা এক সময় গেল তলাইয়া।

১৩

আশ্রমে না গিয়া টুলু কয়েক মাইল ঘুরিয়া আগে থানায়ই গিয়া উঠিল, নষ্ট করিবার সময় একেবারেই নাই যে। দারোগা চিঠিটা পড়িয়া বলিল—"বেশ্, পাবেন, হবে ব্যবস্থা।"

টুলুর মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল—"একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতে হবে—এইটুকু অনুরোধ স্যার, আমাদের স্টক একেবারে নেই।"

"এতে লেখাই রয়েছে—আর্জেণ্ট।"

কি মনে হওয়ায়—হয়তো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অনুগ্রহভাজন মনে করিয়াই—চিঠিটা টুলুর চোখের সামনে তুলিয়া ধরিল। টুলুর দীপ্ত মুখখানা একেবারে যেন ছাইয়ের মত হইয়া গেল।—লেখা আছে, তদন্ত করার পর সাত দিনের জন্য পঁচিশ জন লোকের চালের ব্যবস্থা করা হোক।

এতবড় ভাবান্তর দারোগার দৃষ্টি এড়ায় না, একটু কৌতূহলী হইয়াই প্রশ্ন করিল—"মুষড়ে গেলেন যে! কম হয়েছে? চাল যে একেবারেই কাউকে দেওয়া হচ্ছে না। কতজন লোক আপনাদের?"

বিপদের মুখে এমন তড়িৎগতিতে জীবনে আর কখনও টুলুর এমন চমৎকার বুদ্ধি জোগাইয়া যায় নাই, একটু আবদারের হাসি হাসিয়া বলিল—"না স্যার, লোকের সংখ্যা ঠিকই আছে, জন তিরিশের জায়গায় না হয় পঁচিশ জন করেছেন

—পাঁচজন কারটেল্ ক'রে ; ও আমরা চালিয়ে নোব। একটু দ'মে গেলাম সময়টা দেখে—মোটে সাতদিন !"

একটু দুঃখের ভান করিয়া মুখটা নিচু করিল, তাহার পর একটু খোসামোদের ভান করিল; মুখটা তুলিয়া অল্প হাসিয়া বলিল—"বেশ, আপনারা রয়েছেন, আমাদের মালিক তো আপনারাই।"

টুলু নিজের এই নবতম শক্তির মধ্যে যেন মাস্টারমশাইয়ের আশীর্বাদ অনুভব করিতেছে।

দারোগা হাসিয়া বলিল—"বেশ, সে হবে 'খন···দেখা যাবে।"

ভদ্র মুখের খোসামোদ নিশ্চয় বেশি সুড়সুড়ি দেয় মনে, মুখে একটু অমায়িক হাসিও ফুটিল।

"কখন আসছেন তদন্ত করতে স্যার ?"—একটু উদ্বিগ্ন ভাবেই মুখের পানে চাহিয়া রহিল টুলু—উদ্বেগটাকে চাপা দেবার জন্য বলিল—"আজ বিকেলে ? তা হ'লে ওদের খাওয়ার ব্যবস্থাটা বিকেলেই করি আর কি, দেখেন আপনি, ওরা একটু বল পায় মনে।"

"তাই আসা যাবে।"

আর একটা দরকারী কথা বাকি, টুলু ভিতরে ভিতরে মস্তিষ্কচালনা করিতেছিল, খোসামুদী আবদারের স্বরে বলিল—"আর একটি অনুরোধ স্যার, যদি রাখেন···"

খোসামোদের রসান্ তো আছেই, তাহা ভিন্ন যে উপরে খাতির পাইয়াছে নিচের খাতিরও তাহার সুলভ, দারোগা হাসিয়াই বলিল—"আবার কি ?"

"চেয়েছিলাম তিরিশ জনের, স্যাংকৃশন্ করেছেন পঁচিশের। ওঁর মন জুগিয়ে চলাই ভাল মনে করছি—যখন দয়ার ভাব আছে···আপনি অনুগ্রহ ক'রে লিখে দেবেন—বাকিদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, শুধু, the rest have been removed."

"দেবেন তো সরিয়ে?"—ঠোঁটে মৃদু হাসি লইয়া একটু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

টুলুও পরাজয়ের অভিনয় করিয়া মাথাটা নিচু করিয়া অল্প হাসিল। দারোগা প্রশ্রয়ের হাসি হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা, যান। সে সব হবে 'খন।"

টুলু উঠিয়া নমস্কার করিয়াও আরও একবার বলিল—"শুধু, **the rest have been removed,** স্যার।"

আর একবার নমস্কার করিয়া গাড়িতে উঠিল। মোড় ঘুরিয়া থানাটা দৃষ্টির অন্তরালে হইয়া যাওয়া মাত্রই বলিল—"যত জোরে পার চালাও গিরিধারী।"

"সমস্ত রাত চলেছে, হাক্লান্ত রয়েছে দাদাঠাকুর।"···কতকটা সত্যই বলিল, কতকটা বোধ হয় কাল তাড়না করিতে পায় নাই সেই আক্রোশে।

টুলু বলিল—"তা হোক্, ল্যাজ-মলা দাও···একটু ক'ষে দাও, ও-রকমে হবে না।"

ঘুর-পথে প্রায় দশটার সময় আশ্রমে নামিল, অন্য কোনদিকে না গিয়া একেবারে বাসায় গিয়া উঠিল। চম্পা সামনেই ছিল, প্রশ্ন করিল—"পেলেন চাল?"

"না, নরোত্তমকে একবার ডেকে পাঠাও, আছে তো এখানে?"

হীরা বাপ আসিয়াছে দেখিয়া খেলা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিতেছিল, চম্পা তাহাকে বলিল—"তোমার দাদাভাইকে ডেকে নিয়ে এসো···শোন, আস্তে আস্তে ডেকে নিয়ে এসো, হৈ-চৈ ক'রো না।"

টুলুর মুখের পানে চাহিয়া কোন প্রশ্ন করিতে যেন সাহস হইল না, এত বিচলিত দেখে নাই কখনও ওকে, অত্যন্ত অন্যমনস্ক, কপালের শিরগুলা ঠেলিয়া উঠিয়াছে, চোখ দুইটা লাল, রাত্রিজাগরণের জন্যই নয়, যেন জ্বলিতেছে। চম্পা চুপ করিয়া দরজায় ঠেস দিয়া বার কয়েক শুধু চোখ তুলিয়া দেখিল, একবার চোখাচোখি হইতে টুলু বুকে খানিকটা বাতাস ভরিয়া লইয়া বলিল—"আবার 'আর্জেণ্ট!' ঠাট্টা হয়েছে—ঠাট্টা!"

মাঝখান থেকে হঠাৎ একটা কথায় চম্পা চুপ করিয়াই রহিল।…নরোত্তম আসিতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, টুলু বলিল—“না, থাকো তুমি।” হীরক কপাটের বাহিরে থেকেই বাপের চেহারা দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, চম্পা তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল—“যাও, খেলোগে এখন।”

টুলু নরোত্তমের পানে চাহিয়া বলিল—“না, চাল পেলাম না—দেখা করে না—অনেক কষ্টে হ’ল তো একটা সীল-করা খাম দিলে থানার দারোগার নামে—সেই-খান থেকেই আসছি—মাত্র পঁচিশ জনের চাল—সাতদিনের যুগ্যি, তার সঙ্গে ঠাট্টাও আছে একটু—রসিকতা !…”

যেন ছেলেমানুষের সঙ্গে কথা কহিতেছে, নরোত্তম এইভাবে একটু হাসিয়া শান্ত কণ্ঠেই বলিল—“চাল যোগাড়ের পথ নয় ওটা, তা…। এখন ফল এই হ’ল যে…”

চম্পার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—“মা-মণি, একটু ওদিকে যাও তো।”

টুলু বলিল—“চম্পা সব জানে, কি বলছিলে বল।”

নরোত্তম খুব বিস্মিত হইল না, চম্পার মুখের উপর দিয়া দৃষ্টিটা একবার ঘুরাইয়া আনিয়া বলিল—“বলছিলাম ফল এই হ’ল যে, এখন সে-সব করতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে যাবে কাদের কাণ্ড, তারপর সঙ্গে সঙ্গেই…”

টুলু বলিল—“সে দিক আমি বাঁচিয়ে এসেছি, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গেয়ে এসেছি—লঙ্গরখানাটা ভেঙে দেবারই চেষ্টা করব—গবর্মেণ্টের চাল অপচয় করতে চাই না; দারোগাকে জপিয়ে এসেছি—মাত্র পঁচিশজনেই আছে ব’লে রিপোর্ট দেবে।”

চম্পার পানে চাহিয়া একটু অদ্ভুতভাবে হাসিয়া বলিল—“আমি এতদিনে পুরোপুরি মাস্টারমশাইয়ের মন্ত্রশিষ্য হয়ে উঠেছি।”

দুজনকেই বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—“না, দু’শ লোক দেখে লিখবে—পঁচিশ, এতবড় আত্মীয়তা করতে পারি নি, সেটা মুখের খোসামোদে

হয়ও না। ব্যবস্থা করতে হবে, সেই জন্যেই ডেকেছি তোমায়। এদের মধ্যে কিছু সর্দার-গোছের আছে, না ?—যাদের কথা চলে ?"

নরোত্তম বলিল—"আছে, দলে দলেই এসেছে তো ?...হ্যাঁ, এখন তো দু'শ নয়, আবার প্রায় আড়াইশয় এসে ঠেকেছে।"

"তা আসুক, তুমি তাদের ডেকে নিয়ে এসো, গোলমাল না হয়।"

নরোত্তম চলিয়া গেলে চম্পা বলিল—"সমস্ত রাত জেগে আছেন, নেয়ে খেয়ে নেবেন না আগে ?"

টুলু একটু ব্যঙ্গের স্বরেই প্রশ্ন করিল—"আগে ঐটেই দরকার ?"

চম্পা একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া গেল। টুলু বুকে হাত দুইটা জড়াইয়া মাথা হেঁট করিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। একটু পরে নরোত্তম জন দশেক লোককে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল—তাহার মধ্যে দুইজন স্ত্রীলোক, টুলু দরজার কাছে আসিয়া বলিল—"একটা কাজ করতে হবে তোমাদের, রান্না তাড়াতাড়ি করিয়ে দিচ্ছি, সবাইকে খাইয়ে-দাইয়ে ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়িতে জন ত্রিশেককে এখানে রেখে বাকি সবাইকে কখানা গ্রামের মধ্যে লুকিয়ে ফেলতে হবে আজকের রাত্তিরটার জন্যে—নরোত্তম ব্যবস্থা ক'রে দেবে। কথাটা নিয়ে চেঁচামেচি হবে না, বাইরে প্রকাশ পাবে না।" নরোত্তম আরম্ভই করিয়া দিল ব্যবস্থাটা, ওদের দিকেই চাহিয়া—"বলোগে, দারোগা আসছে টের পেলেই লরিতে ক'রে চালান দেবে।"

টুলু বলিল—"যারা থাকবে তাদের ছেলে বুড়ো যে কাউকে জিগোস করলে যেন বলে—আমরা বরাবর এত কটিই আছি। আর এক কথা, যারা থাকবে—জন তিরিশ, তাদের জন্যে ঠিক তিনটের সময় আর একবার রান্না চড়বে।"

নরোত্তম টুলুর পানে চাহিয়াই বলিল—"তাদের রান্না বরং এখন চড়িয়ে কাজ নেই।"

"এতক্ষণ উপোসী থাকবে ?"

"নইল হাভাতের মতন জলুস বেরুবে কি ক'রে চেহারায় বাবাঠাকুর ?

দারোগার দিষ্টিতে সেটুকু তো পড়া দরকার! একে তো খেয়ে-দেয়ে পুরন্ত হয়ে এসেছে সবাই।"

দুঃখের মধ্যেও টুলু আর চম্পার ঠোঁট একটু হাসিতে কুঞ্চিত হইয়া উঠিলই।

উহারা চলিয়া গেলে টুলু বলিল—"এখন সে ব্যাপারের কি করবে বলো নরোত্তম? দেরি তো একদণ্ড করা চলে না।"

"হবেও না দেরি, সবাই তোয়ের কাছে, আজ রাত্তিরেই।"

টুলু একটু বিস্মিতভাবে চাহিয়া বলিল—"তোয়ের আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তোয়ের আছে বইকি। আপনার এ উপায় তো খাটবে না, জানতুম…"

অভিযানের ব্যাপারটা যতক্ষণ কল্পনার মধ্যে ছিল, একরকম ছিল, প্রায় বাস্তবরূপে দেখিয়া টুলু একটু বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া রহিল—রীতিমত একটা ডাকাতি…তাহারাই করিতে যাইতেছে…আজ রাত্রেই…

প্রশ্ন করিল—"কজন থাকবে?"

এর গায়ে-গায়েই আবার প্রশ্ন করিল—"কিন্তু নিয়ে আসবে কি ক'রে? এক-আধ থলে নয়তো…"

নরোত্তম একটু কি ভাবিয়া লইয়া বলিল—"দাঁড়ান, আপনাকে সব ব্যবস্থাই দেখিয়ে দিই।"

বাহির হইয়া গেল।

আবার চুপচাপ। টুলু সেইভাবে ঘাড় হেঁট করিয়া পায়চারি করিতে লাগিল, চম্পা ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আওয়াজের মধ্যে এক সময় সজোরে তাহার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল; টুলু মুখ তুলিয়া চাহিল না; কানে যায় নাই।

মিনিট তিন-চার পরে নরোত্তম ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে নয়জন লোক, তিনজনকে টুলু চেনে, দুইজন এই আশ্রমেরই, বাহিরে থেকে আসিয়া কাজ করে, আর একজন ভুখ-মিছিলের লোক, আশ্রমের অন্নজীবী। বাকি ছয়জনকে টুলু

কখনও দেখে নাই, তাহাদের মধ্যে একজন বিশেষ করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—লোকটা ছ-ফুটের ওপর লম্বা, একমুখ দাড়ি-গোঁফ, কেশবহুল দক্ষিণ হাতে একটা লোহার বালা ; শিখ একজন।

নরোত্তম বলিল—"এরাই থাকবে।"

শিখটিকে দেখাইয়া বলিল—"এর একটি গাড়ি আছে, তাইতেই মাল আসবে।"

সবাইকে যাইতে বলিল, চলিয়া গেলে একটু পরিচয় দিল,—বাইরের তুজনের মধ্যে পাঁচজন মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে শেষের দিকে ছিল, এখন দক্ষিণে গিয়া তমলুক অঞ্চলে কাজ করিতেছে। শিখ লোকটির একটু ইতিহাস আছে, তমলুক অঞ্চলে খান তিনেক লরি চালাইয়া রোজগার করিতেছিল, বঞ্চন-নীতির ফলে তুইখানি লরি গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়া বাকি একটি লইয়া তাহাকে নির্দিষ্ট রেখার বাহিরে চলিয়া আসিতে বাধ্য করে। পরশু রাতে সে নরোত্তমের সহিত নিভৃতে দেখা করিয়া বলে—যদি দরকার হয় তো সে তু বোরা চাল দিতে পারে।···নিবিড়তর পরিচয় হয়, বলিতেছে—সে চাটগাঁ আর্মারি ব্যাপারে ছিটকাইয়া বাহির হইয়া পড়ে ; ঠিক করিয়াছিল, শান্তভাবেই জীবন যাপন করিবে, গবর্মেণ্টের নূতন অত্যাচারে আবার ভেতরে ভেতরে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। চাল কোথা থেকে কিভাবে যোগাড় করিল বলিল না, তবে দিয়াছে অত্যন্ত সস্তায়। বলিতেছে, একটা পেট আর একটা লরি চলিলেই হইল তাহার।

অদ্ভুত সময়ে অদ্ভুত সমাবেশ হয়, অদ্ভুত রকম খবর সব আসিয়া পৌছায়। টুলু একবার চম্পার পানে চাহিল, সে তাহার দিকেই স্থির ভাবে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নরোত্তম প্ল্যানের বাকিটাও বলিল—"এখান থেকে প্রায় পনেরো মাইল দূরে, বড় রাস্তা থেকে নামিয়া মাইল পাঁচেকের মধ্যে প্রসাদ মাইতির বড় আড়ৎ, গ্রাম থেকে একটু তফাতে নদীর পাড়ে ঘাট ঘেঁষিয়া, অভিযানটা সেইখানে ; লোকটার বর্ধমান অঞ্চলে তুইটা কল, কলিকাতায় নাকি খান তিনেক বাড়ি কিনিয়াছে।

নরোত্তম বলিল—"এক স্থবিধে, লরিতে ক'রে ওর চাল মাঝে মাঝে আসেই, কারুর চোখে পড়বে না।"

টুলু বলিল—"বেশ মোটামুটি বুঝলাম, নেয়ে খেয়ে তোমায় আবার ডেকে নেবো, এখন যাও, ওদিকটা তাড়াতাড়ি সামলে নাওগে; শিখটিকে আগে সরিয়ে ফেল এ-তল্লাট থেকে।…তা হ'লে আমরা এগারো জন হলাম…"

নরোত্তম বিস্মিতভাবে চাহিয়া বলিল—"আপনিও নিজে যাবেন?…এসব ব্যাপারের কিছু বোঝেন না…"

টুলু একটু হাসিয়া বলিল—"তোমরাও যে পেশাদারী লুটেরা এটা তো আজ প্রথম শুনলাম।"

নরোত্তম চলিয়া গেল, চলার ভাব দেখিয়া মনে হইল, মুখে যাহাই বলুক, টুলুর এই যাবার কথাটায় ওর মনে যেন হঠাৎ উৎসাহের জোয়ার আসিয়া গেছে।

টুলু চম্পাকে প্রশ্ন করিল—"কি বলো চম্পা?"

বেশ সহজ চম্পার মুখের ভাবটা, সঙ্কল্পে কঠিনও, বলিল—"বলব আর কি? ঠিকই করেছেন, আশ্রয় দিয়ে তো আর লোকগুলোকে মেরে ফেলা যায় না।"

উত্তরে, উত্তরের ভঙ্গিতে টুলু বেশ একটু বিস্মিতই হইল।

স্নানাহারটা সারিতে একটু বিলম্ব হইল। শেষ হইলে একবার বাহিরে আসিয়া দেখিল, প্রাঙ্গণ একেবারে খালি, দুর্গতদের জন ত্রিশেক লোক চোখে পড়ে—ছেলেমেয়ে আর বুড়োরা ঘোরাঘুরি করিতেছে, যাহারা একটু সক্ষম, কয়েকজন লোকের সঙ্গে ওদিককার উনান ও ফ্যানের নর্দমাগুলা বুজাইতে ব্যস্ত। নরোত্তম কাছে আসিয়া বলিল—"সব এখুনি সরিয়ে দিলুম বাবাঠাকুর, দারোগা পুলিসকে বিশ্বাস করতে আছে? বলবে চারটেয় আসছি, এসে পড়বে বোধ হয় একটায়। আর ঐ একটা রেখে বাকি উনুনগুলোও বুজিয়ে দিচ্ছি এখনকার মতন, ওপরে খড়-কাট ছাইপাশ দিয়ে ভরিয়ে দোব, টের পেতে হবে না স্মুন্দিকে…"

সত্যই খুব উৎসাহ আসিয়াছে নরোত্তমের। ক্লান্তিতে, ঘুমে শরীর ভাঙিয়া আসিয়াছিল, একটু এদিক ওদিক দেখিয়া লইয়া টুলু নিদ্রা দিতে গেল।

১৪

যতক্ষণ টুলু জাগিয়াছিল চম্পা মুখের সহজ ভাবটা ধরিয়া রাখিল। টুলুর বরং মনে হইল, নরোত্তমের মতই চম্পার মুখটাও যেন নূতন উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। টুলু মুগ্ধ হইল, খনির গহ্বরের সেই মেয়ে চম্পা, এত উঁচুতে উঠিবার ক্ষমতা ছিল না তাহার।

টুলু ঘুমাইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চম্পা একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিল, এত গাঢ় আতঙ্কের ছায়া গঞ্জডিহির পরে আর পড়ে নাই তাহার মুখে, যেন সব গেল, কী করিবে, কোথায় যাইবে, ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। খানিকটা ছটফট করিয়া বেড়াইল, তাহার পর এক সময় টুলুর ঘর থেকে দোয়াত কলম ও একটু কাগজ লইয়া নিজের ঘরে গিয়া লিখিতে বসিয়া গেল। নরোত্তম বাহিরের কাজের তদারকে ব্যস্ত ছিল, চিঠিটা শেষ হইলে চম্পা তাহাকে ডাকিয়া লইয়া অফিস-ঘরে চলিয়া গেল এবং একটু ভিতরের দিকে গিয়া সামনাসামনি হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"একটা কাজ তোমায় করতে হবে নরু।"

ভাব দেখিয়া নরোত্তম বিস্মিত হইল, চম্পা একটু একটু কাঁপিতেছে, ঠোঁট দুইটা একবার থরথর করিয়া উঠিল, সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, চম্পা বলিল কথাটা আদেশের স্বরে, যা কখনও ও করে না—ও পণ্ডিতমশাইয়ের কন্যা, এই আশ্রমের কর্ত্রী এইরকম একটা দাবির সহিত।

প্রশ্ন করিল—"কি কাজ মা-মণি?"

চম্পা ঠোঁটের একটা কোণ একটু কামড়াইয়া ধরিয়া মুখটা ঘুরাইয়া লইল একটু, যেন নিজের সঙ্গে লড়াইয়ে আর পারিতেছে না, তাহার পর মুঠার চিঠিটা নরোত্তমের সামনে বাড়াইয়া বলিল—"এই চিঠিটা—একটুও দেরি না ক'রে

সবচেয়ে তোমার যে বিশ্বাসী আর যে সবচেয়ে আগে পৌঁছুতে পারবে তাকে দিয়ে মহকুমা শহরে পাঠিয়ে দাও—মেয়ে-স্কুলের মাস্টারনী—নাম তটিনী হাজরা—তার হাতে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে কি জবাব দেয় নিয়ে চ'লে আসবে—এই কুড়ি-বাইশ মাইল পথ যে না জিরিয়ে চ'লে আসতে পারবে—আর···"

কেহ আসিতেছে কি না একবার ফিরিয়া দেখিয়া লইল, তাহার পর আদেশের ভঙ্গি একেবারে ভুলিয়া, একপা অগ্রসর হইয়া নরোত্তমের ডান হাতটা ধরিয়া দীন মিনতির স্বরে বলিল—"আর আজকের রাতটা তোমরা থেমে যাও নরোত্তম—মাত্র একটা রাত—আমি তোমাদের পণ্ডিতমশাইয়ের মেয়ে—ভিক্ষে চাইছি তোমার কাছে—শুধু একটা রাত থেমে যাও। কোনও রকমে ওঁকে বুঝিয়ে বল, শুধু আমি যে বলেছি—এইটুকু প্রকাশ করবে না, আর কখনও তোমার কাছে কিছু চাই নি···"

নরোত্তম বাঁ হাতটা চম্পার কাঁধের ওপর একটু টানিয়া দিয়া বলিল—"একটু থির হও মা-মণি, কি এমন ব্যাপার যে অত ক'রে বলছ তুমি ?···যাব না আজ, তার হয়েছে কি ?···ছাও তোমার চিঠি···কাক-কোকিলে জানবে না এ কথা···"

একটু যেন আশ্বস্ত হইয়া ভিতরে ভিতরে আরও অসংযত হইয়া উঠিল চম্পা, চিঠিটা মুঠার মধ্যে চাপিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আত্মদ্বন্দ্বের মর্মান্তিক যাতনায় মুখটা এক-একবার কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, সেই যাতনার মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে যেন কঠিন হইয়াও উঠিতেছে, বার দুয়েক এদিক ওদিক চাহিয়া চিঠিটা দুই হাতে কুঁচি কুঁচি করিয়া ছিঁড়িয়া কোণের দিকে ফেলিয়া দিল, ঠোঁট দুইটা আবার কামড়াইয়া ধরিয়াছে, নরোত্তমের দিকে চাহিয়া বলিল—"থাক্ নরু, বড্ড ভুল হয়ে যাচ্ছিল, নিজের কথাই ভাবছি শুধু···ওদের কি হবে ?···যাও।"

নরোত্তম একটু বিমূঢ়ভাবে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, প্রাঙ্গণে খানিকটা গিয়া নিজের মনেই বিড় বিড় করিয়া বলিল—"হুঁঃ, মেয়েছেলে এনে থোবেন ইর মধ্যে—হবে না ?"

চম্পা একটু স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সবার দৃষ্টি থেকে নিজের মুখটা

যেন কোন রকমে বাঁচাইয়া হনহন করিয়া বাসায় চলিয়া গেল, তাহার পার একেবারে নিজের ঘরে গিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; রুদ্ধকণ্ঠে একটা চাপা কাতরানি—"আমি আর পারছি না—আর ওপরে ওঠবার ক্ষমতা নেই আমার—কি হবে?...আমি তোমার পায়ের নাগাল আর পাচ্ছি না—আর সাধ্যি নেই আমার—প'ড়ে রইলাম—আমায় ক্ষমা ক'রো—ক্ষমা ক'রো আমায়..."

তদন্তের আর তেমন গুরুত্ব ছিল না, দারোগা আর সাত-আট মাইল পথ ঠেলিয়া নিজে আসিল না, হেড কন্‌স্টেব্‌ল্-গোছের একজন আসিয়া, দারোগার চেয়েও ঢের বেশি তম্বিসহকারে চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া, যথারীতি বিদায়-দক্ষিণা পকেটে করিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পর রাত্রি যখন নিষুপ্ত, আহারাদি সারিয়া আশ্রমের লোকেরা আর দুর্গতরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন, আশেপাশের গ্রামের মধ্যেও এক শেয়াল-কুকুরের রব ছাড়া অন্য কোন শব্দ নাই, দশজনে আফিস-ঘরে জমা হইল। চম্পাও ছিল, কি মনে করিয়া টুলু ওকে বাসা থেকে সঙ্গে করিয়াই ডাকিয়া আনিয়াছিল। নাই শুধু শিখ লোকটি, সে মাইল চারেক তফাতে বড় রাস্তায় লরি লইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

নরোত্তম একবার সব মিলাইয়া লইল—সবার কাছেই আছে একটা করিয়া অস্ত্র, তা ভিন্ন তালা ভাঙিবার এক সেট যন্ত্র, টর্চ, খানিকটা ক্লোরোফর্‌ম্। টুলু বলিল—"সব তোয়ের, তা হ'লে বেরুতে পারা যায়?"

তাহার পর হঠাৎ চকিত হইয়া বলিল—"এই দেখো, পরকে জিগ্যেস করছি, অথচ আমি নিজেই তোয়ের নেই।"

পকেট থেকে চাবিটা লইয়া চম্পার হাতে দিয়া বলিল—"খাটের শিয়রের বাক্সটার মধ্যে মাস্টারমশাইয়ের রাইফেলটা আছে, নিয়ে এস।"

এটুকু যে সাজানো—ইচ্ছা করিয়াই তোলা—চম্পার বুঝিতে বাকি থাকে না,

একটু পরে রাইফেলটা আনিয়া হাতে তুলিয়া দিতে দিতে হাসিয়াই বলিল—"আমার পরীক্ষা আর শেষ হবে না আপনার কাছে!"

টুলুও একটু হাসিয়াই বলিল—"হবে।...জানো নরোত্তম, আমি মাস্টার-মশাইয়ের হাত থেকে তাঁর অস্ত্র চেয়ে দীক্ষা নিয়েছিলাম। আজ যখন ফিরে আসব—যদি আসি, চম্পা আমার হাত থেকে এই রাইফেলটা নিজেই নেবে চেয়ে। জোর ক'রে তো আর দীক্ষা হয় না..."

আর বিলম্ব না করিয়া উহারা আশ্রম ছাড়িয়া ধীরে ধীরে অন্ধকারের সঙ্গে মিশাইয়া গেল। চম্পা আদেশমত কয়েকজনকে ডাকিয়া অফিস-ঘরে শয়ন করাইয়া বাসায় চলিয়া গেল।

সেইদিনকার মত ঝড়, সেদিন ছিল বাহিরে, আজ অন্তরে, তাহারই প্রলয়-আলোড়নে উৎক্ষিপ্ত মন লইয়া চম্পা চুপ করিয়া শুইয়া রহিল, আর পারে না, যেন শতচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে।...চোখে বন্যা নামিল, শুকাইল, আবার নামিল, তাহার পরে এক সময় কি করিয়া মনটা গেল শান্ত হইয়া। মনে ধীরে ধীরে অন্যভাবের ঢল নামিল—পারিবে চম্পা, পারিতে হইবে, এই দেশেই—এই জেলাতেই তো সত্তর বছরের বৃদ্ধা প্রাণ দিল—এই সেদিন—বৃদ্ধা, জীবনের শক্তি যাহার সমস্তই ক্ষয়িত—চম্পা পারিবে না কেন?—আর না পারার অর্থ যে টুলুকে হারানো, এতদিনের তপস্যা নিজের হাতে মুছিয়া ফেলা...

হীরাকে লইয়া শুইয়া ছিল, বুকে চাপিয়া আপন মনেই বলিল—"পারব রে হীরা, নোব দীক্ষা, দেখিস—বাবা-মায়ে একসঙ্গে না তোয়ের হ'লে তুই তোয়ের হবি কোথা থেকে?—কত মা তোর মতন হীরের হার যে বুক থেকে নামিয়ে দিলে, তুই তোয়ের না হ'লে যে আবার এই রকম হবে...আমি পারব—দেখিস..."

হীরাকে তুলিল, ভাল করিয়া জাগাইয়া বলিল—"কি রকম ছেলে রে তুই?...মাকে একা রেখে বাবা চ'লে গেল, ছেলে কোথায় পাহারা দেবে, না, ফোঁস ফোঁস ক'রে ঘুমুচ্ছে!"

হীরা একটু বিমূঢ়ভাবেই বলিল—"কোথায় গেছেন মা বাবা?—ও-ঘরে নেই?"

ঝোঁকের মাথায়ই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছে, চম্পা বুঝিল ভুল হইয়া গেছে, একটু ভাবিয়া বলিল—"যাবেন আর কোথায়? আশ্রমেই রয়েছেন, বাইরে; নতুন আবার একদল এল এক্ষুনি কিনা। তা আশ্রমে গেলেও আমার ভয় করে না? তোর পাহারাতেই তো আমায় রেখে যান···তুই এদিকে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিস!"

বাহিরে শৃগালের দল বোধ হয় দ্বিতীয় যাম ঘোষণা করিল। হীরা একটু ঘেঁষিয়া আসিয়া মাকে আলগাভাবে জড়াইয়া বলিল—"না, কিচ্ছু ভয় নেই, আমি জেগে আছি, ঘুমুব না আর।"

"ওঁকে আমিও তাই বললাম—তুমি যাও, আমার হীরে রয়েছে, কাকে ভয়?···হ্যাঁ রে হীরে, তুইও বড় হয়ে তোর বাবার মতন এই সব গরিব-দুঃখীদের দেখবি তো?—যাদের ঘর প'ড়ে যাচ্ছে, মরাই ভেসে যাচ্ছে, ছেলেমেয়ে বুক থেকে খ'সে পড়ছে, যারা ফ্যানের ওপর মুখ থুবড়ে মরছে···"

হীরার বীরত্ব সাড়া দিয়া উঠিতেছে, বলিল—"জানো মা, এই সব করেছে ইংরেজে—দাদাভাই বলেছে, আমি আগে তাদের দেশছাড়া ক'রে তারপর এদের ঘর বেঁধে দোব, মরাই তুলে দেব, ফ্যান খেতে দোব না···দাদাভাই আমায় সব বলেছে মা, আমি রামের মতন রাজ্যসুখ চাইব না, লক্ষ্মণের মতন চোখে ঘুমের বুড়ি নামলে তাকে তীর দিয়ে মেরে ফেলব—খালি দেখে বেড়াব, কোথায় কার দুঃখু আছে···কোথায় কে খেতে পাচ্ছে না···কে কার ধানের মরাই ভেঙেছে···"

ছল করিয়া শোনে মা, বুকে এ এক নূতন ধরনের আলোড়ন জাগে, সন্তানকে চাপিয়া চাপিয়া ধরে। ওর বাপ এখন বোধ হয় এই কাজই করিতেছে—কে গরিবের মরাই ভাঙিয়া, একমুঠি অন্নের সংস্থান হরণ করিয়া, অন্নের পাহাড় করিতেছে জমা,—ভগবানের উদ্যত কোপের মতই হীরার বাপ তাহার মস্তকে আসিয়াছে নামিয়া—এতক্ষণ—এই নিশীথ রজনীতে—রামচন্দ্রের মতই সর্বত্যাগী বাপ ওর, লক্ষ্মণের মতই তপস্যায় অতন্দ্র।

প্রতিজ্ঞায় মায়ের মনও দৃঢ় হইয়া উঠে, তাহার পর আবার আশীর্বাদে হইয়া

আসে শিথিল, সন্তানের পিঠে ধীরে ধীরে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে চম্পা বলে—“না, তোকে ওসব করতে হবে না হীরে, আমি আশীর্বাদ করছি। এ দুঃখের বোঝা ভগবান দিয়েছিলেন তোর দাদুর ঘাড়ে, তোর বাবার ঘাড়ে, তাঁরাই যত দুঃখের কাঁটা পরিষ্কার ক'রে দেশকে তোদের হাতে দিয়ে যাবেন, তোরা সেখানে সুখে ফসল ফলিয়ে যাবি···”

বুকে চাপিয়া ধরে, বলে—“বুঝতে পারিস আমার আশীর্বাদ হীরা ?—তোদের কাজ হবে আরও বড়, তোরা বড় বড় শহর বসাবি, দেবতাদের জন্যে বড় বড় দেউল তুলবি, বিশ্বের জন্যে বড় বড় বাড়ি তুলবি ; তোরাও রাতকে রাত জেগে কাটাবি—তবে তোদের রাতজাগা এ রকম দুঃখের জাগা হবে না ; তোরা নতুন নতুন রাস্তা গড়বি, নিজের দেশকে গ'ড়ে নিয়ে তোরা সেই রাস্তায় দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বি—তোদের দেশের লোকেরা এক সময় করেছিলেন তাই, জানিস হীরা ?—তোরাও আবার করবি—এ দেশের লোক ব'লে তোদের পূজো করবার জন্যে দেশ-বিদেশের লোক···”

হীরা বাধা দেয়—“মা !”

আবেগের মুখে ডাকটা বোধ হয় বেশি মিষ্ট লাগে, চম্পা বুকের একটা চাপ দেয়, প্রশ্ন করে—“কি রে হীরে ?”

“সেই যে—‘থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে’···না মা ?”

“হ্যাঁ, বল্ তো হীরে, শুনি।”

ছড়া আওড়াইবার পালাই চলে এর পর, এই পথেই মা-ছেলের যুগ্ম আবেগটা মুক্তি পায়, একটা নয়, যত সব জানা আছে হীরার—হেম, রবীন্দ্র, সত্যেন্দ্র, নজরুল···যাঁরা সবাই আশার গান গাহিয়া গেছেন, মহত্ত্বকে বন্দনা করিয়া গেছেন, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মানবাত্মার বিজয় অভিযানের পুণ্যগাথা রচিয়া গেছেন।

হীরার বাপ গেছে সেই পথই পরিষ্কার করিতে, দুঃখের যাত্রা—দিনের আগে রাত্রির মত···চম্পা পারিবে, শুধু টুলুই নয়তো, তাহার সন্তানও যে চম্পাকে করিতেছে দীক্ষিত, ছেলেও যে মাকে গড়ে।

১৫

কাঁচা পথ, কিন্তু মুরাম কাঁকরের বলিয়া মোটামুটি বেশ মসৃণ, অন্ধকার ভেদ করিয়া লরিটা ছুটিয়া চলিল। প্রায় মাইল পাঁচেক আসার পর সামনে একটা তেমাথা পড়িল, এইখান থেকে ডান দিকের পথটা উত্তর-পূর্বে মহকুমা শহরের দিকে চলিয়া গেছে, টুলুদের যাইতে হইবে বাঁ দিকে।

নিতান্ত আকস্মিক একটা ঘটনা—একটু ভুল—তাহাতেই চাল-অভিযানের সবটা ওলট-পালট হইয়া গেল; ড্রাইভারের ভুলে লরিটা ডান দিকের রাস্তায় ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, শ খানেক গজ যাওয়ার পরই নরোত্তম বলিল—"শহরের রাস্তা ধরেছেন শিখজি, ব্যাক করুন।"

ব্যাক করিতে যে সময়টা লাগিল তাহাতে আর একটা ব্যাপার হইল; রাস্তাটা শ' তিনেক গজ দূরে কতকগুলা গাছপালার আড়ালে ঘুরিয়া গেছে, যতক্ষণ লরিটা পিছু চলিয়া তেমাথায় আসিয়া পড়িয়াছে, দেখা গেল, সেই গাছপালার আড়াল থেকে একটা ছইওলা বলদ-গাড়ি বাহির হইল, তাহার পর আর একটা। ফুটফুটে জ্যোৎস্না, বেশ স্পষ্টই পড়িল নজরে।...লরিটা মুখ ঘুরাইয়া বাঁ দিকের রাস্তায় ঢুকিল। নরোত্তম হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল, খানিকটা যাওয়ার পরই ড্রাইভারের বাঁ হাতের ওপরটা চাপিয়া বলিল—"শিখজি, একটু থামান তো।"

গাড়িটা ব্রেকের শব্দ করিয়া থামিয়া পড়িল।

নরোত্তম টুলুর পানে চাহিয়া বলিল—"আমি বলছিলাম দু-দুটো গাড়ি হঠাৎ একের পিঠে এক ক'রে আসে কেন?"

"কি হয়েছে তাতে?"

"অনেক সময় এই সব চাল আসে আড়ৎদারদের, চোরাগুদামে সরাবার এ-ই সময় কিনা।"

একটু নিস্তব্ধতা গেল, নরোত্তমের ভিতরে অন্য কে একজন যেন জাগিয়া উঠিতেছে। টুলু বলিল—"গেরস্তরও তো হতে পারে।"

নরোত্তম নিজের চিন্তাতেই অন্যমনস্ক ছিল, কথাটা যেন কানে গেল না; লরি থেকে লাফাইয়া পড়িয়া বলিল—"দেখতে হচ্ছে, মা-অন্নপূর্ণা যদি মাঝপথেই হাতে তুলে দেন তো সিঁদকাঠি ধ'রে কি হবে?···কোশ খানেকের মধ্যে গাঁও নেই এখানে। আমি একাই যাই, একটা গলা-খাঁকারি দিলেই এসে পড়বেন সব।"

একটা অদ্ভুত অনুভূতি টুলুকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। মনে পড়িল, এই পথ দিয়াই কাল রাত্রে কি সব রঙিন স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে আসিয়াছিল—এই জ্যোৎস্না ছিল কালও। গলা-খাঁকারি শোনা গেল না, খানিক পরে নরোত্তমই আসিয়া উপস্থিত হইল, একটু দূরে দাঁড়াইয়াই বলিল—"বাবাঠাকুর, আপনাকে নামতে হচ্ছে একবার।"

রহস্যটা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে, টুলু উৎসুক ভাবে লাফাইয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইতে নরোত্তম হঠাৎ ঝুঁকিয়া তাহার পদস্পর্শ করিয়া বলিল—"বাকসিদ্ধ হয়ে গেছি, পায়ের ধূলো গ্যান—মা-অন্নপূর্ণা নিজের হাতে নিয়ে এসেছেন অন্ন, একেবারে কৈলেস থেকে, দেখবেন কি রূপ মায়ের!"

টুলু বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করিল—"কি ব্যাপার নরোত্তম?"

"ব্যাপার একখানি মহাভারত, আসুন না।"

আর কিছু না বলিয়া ঘুরিয়া পা বাড়াইল।

ও-রাস্তায় উঠিয়া একটু যাইতেই টুলু দেখিল, সত্যই একটি স্ত্রীলোকই নামিয়া রাস্তায় দাঁড়াইল, তাহার পরেই একজন পুরুষ; আর কয়েক পা গিয়াই টুলু চিনিল—তটিনী আর কানন।

তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া বলিল—"আপনারা—এদিকে—এত রাত্রে? —ও-গাড়িটাতে কি?"

"চাল নিয়ে যাচ্ছি।"

"কোথায়?"

"আপনার ওখানেই।"

টুলুর গুছাইয়া প্রশ্ন করিবার অবস্থা নাই দেখিয়া বলিয়া চলিল—"আপনি চ'লে আসবার পরই সেক্রেটারির ওখানে যাই ; আপনাকে যা বলেছিলেন আমাকেও তাই বললেন—চাল দিলে চিঠিতে সীলমোহর করত না ; শুধু তাই নয়, দারোগার হাতে এন্‌কোয়ারির ভার দেওয়াটাও তাঁর তেমন ভাল বোধ হ'ল না ; চিঠি সাধারণত কাছাকাছি কোন আড়ৎদারের নামে দিয়ে দেয়।...সব শুনে আমি তাঁকেই ধ'রে বসলাম—চাল কোন রকমে জোগাড় ক'রে দিতেই হবে। আজ প্রায় সমস্ত দিন ওঁর বাড়িতেই ধরনা দিয়ে বসেছিলাম। বড্ড স্নেহ করেন, সমস্ত দিন প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন—কতজনকে ডেকে—বুড়ো মানুষ—নিজেও কত জায়গায় গিয়ে। আজকাল প্রায় সমস্ত আড়তের ওপর গবর্মেণ্টের কড়া নজর, কেউ স্বীকার করলে না। নিরাশ হয়ে সন্ধ্যের সময় বাসায় ফিরে এসে চুপ ক'রে বারান্দায় ব'সে আছি, এমন সময় তাঁর লোক এসে হাজির, ডেকে পাঠিয়েছেন। যেতে বললেন, চাল পেয়েছেন। একটি বড় মাড়োয়ারী আড়ৎদারের মোকদ্দমা হাতে এসেছে, তিনি ফী না নিয়ে চাল দেওয়ার শর্তে রাজি হয়েছেন।"

টুলুকে দুটা প্রশংসার কথা বলিবার সুযোগ দিবার জন্য তটিনী তাহার মুখের দিকে একটু স্মিত হাস্যের সহিত চাহিয়া চুপ করিল। টুলু বলিল—"অদ্ভুত রকম ভাল লোক তো ?"

তটিনী কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলিল—"কী যে স্নেহ করেন ব'লে ওঠা যায় না। ...আড়ৎদার কিন্তু একটা শর্ত চাপিয়ে বসল—"

কথাটা অর্ধেক বলিয়াই চুপ করিয়া গেল। টুলু প্রশ্ন করিল—"কি শর্ত ?"

তটিনী লজ্জিতভাবে বলিল—"এই যা দেখছেন, গভীর রাতে তার আড়ৎ থেকে চাল গিয়ে নিয়ে আসতে হবে ; তা ভিন্ন..."

তটিনী চুপ করিয়া গেল ; ও-কথাটাই ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"সে শুনবেন 'খন এখন চলুন, চাল নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয় আজকাল।"

টুলু বলিল—"কি একটা লুকুচ্ছেন।" একটু হাসিয়া বলিল—"এত শর্তের চাল আমিও শর্তের ওপরই নোব। ব্যাপারটা কি খুলে বলতে হবে।"

তটিনীকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া কাননের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"কি ব্যাপার কানন ?"

কানন একবার দিদির পানে চাহিয়া বলিল—"আর বলেছে, যদি রাস্তায় ধরে তো কোন্ আড়ৎ থেকে নেওয়া হয়েছে নামটা প্রকাশ করতে পারা যাবে না।"

টুলু ভীতভাবেই তটিনীর পানে চাহিয়া বলিল—"এতটা বিপদ আপনি ঘাড়ে ক'রে নিয়েছেন! সেক্রেটারিই বা…"

তটিনী তাড়াতাড়ি বলিল—"তিনি জানেন না আমার আসার কথা—নিজের লোক দিয়েছেন, ঐ গাড়িতে আছে।…কিন্তু আপনিই যে বিপদ বাড়াচ্ছেন রাস্তার মাঝখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে।…চলুন।…হ্যাঁ, আপনিই বা চলেছেন কোথা এত রাত্তিরে ? একটা লরির মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে না ?"

নরোত্তম প্রশ্নটার জন্য যেন ওৎ পাতিয়া ছিল, টুলু মুখ খুলিবার আগেই একপা আগাইয়া আসিয়া বলিল—"সেই যে আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম না, আপনি বললেন—আগে বাবাঠাকুরকে ডেকে আনতে। আমরা চালের জন্যেই যাচ্ছিলাম, ইদিকে এক জায়গায় লুকিয়ে খয়রাৎ করছে এক মাড়োয়ারী। তিনজন আছি, একটা লরি ভাড়া ক'রে নিয়ে যাচ্ছি, যা পাই।"

টুলুর পানে চাহিয়া একটা চোখের কোণ একটু টিপিয়া বলিল—"তা হ'লে আমি লরিটাকে ডেকে আনিগে বাবাঠাকুর, আপনারা দাঁড়ান।"

একটু পরেই লরিটা আসিয়া দাঁড়াইল, আরোহী শুধু শিখ ড্রাইভার।

দুইটা গাড়ি খালাস করিয়া বোরাগুলা লরিতে চাপানো হইল, শেষ হইলে নরোত্তম একবার তটিনীর দিকে একবার টুলুর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"এবার ?"

টুলু তটিনীর পানে চাহিয়া বলিল—"তাই তো ভাবছি, লরিতে যদি যাই সবাই, আধ ঘণ্টায় পৌছে যাওয়া যায় ; কিন্তু…"

তটিনী হাসিয়া বলিল—"নেহাৎ বলেন তো যাব, তবে আমার তো লরিতে চেপে যেতে…"

কানন যেন একটু শিহরিয়া উঠিয়াই বলিল—"না দিদি, তুমি লরিতে লাফাতে লাফাতে যাচ্ছ—এ পিক্‌চার আমি প্রাণ ধ'রে…"

তিনজনেই হাসিয়া উঠিল। কানন টুলুর দিকে চাহিয়া বলিল—"তা ছাড়া এমন চাঁদনি রাতটা আধ ঘণ্টায় কাবার করতে মায়া হয়, মনের কথাটাই বললাম আপনাকে।"

টুলুর মনের কথাও তাহাই, তটিনীর কি কে জানে; কাননকে এতটা উচ্ছ্বসিত হইতে দেখিয়া তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, তাহার পর নরোত্তমকে বলিল—"শুনলে তো? তোমরা এগিয়ে যাও তা হ'লে, আমরা ভোরের দিকে পৌঁছব।"

অন্য গাড়িটাকে ভাড়া দিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হইল।

চারিদিকে খোলা মাঠ, জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটিতেছে, ছইয়ের তরল অন্ধকারে তিনজনে মুখামুখি হইয়া গল্প করিতে করিতে চলিল। তটিনী চাল সংগ্রহের বাকি ইতিহাসটা শেষ করিল, কতকটা নিজে কতকটা কাননের মুখ দিয়া।… আগে কাননকে দিয়াই সেক্রেটারির লোকটিকে সঙ্গে দিয়া চিঠিটা পাঠাইয়া দেয়, নিজে থাকে গাড়ির ছইয়ের মধ্যে। আড়ৎদার টালমাটাল করায় তটিনীকে ভিতরে যাইতে হয়। কানন হাসিয়া বলিল—"দেখলে যখন নেহাৎই নাছোড়বান্দা, নিজেই সব ব্যবস্থা ক'রে দিলে। শুধু কি তাই?—বরং বেশ খাতির ক'রেই বললে—আপনাকে নিজে আসতে হবে না, উকিল সাহেবের আত্মীয়া আপনি—একটা চিঠি লিখে দিলেই হবে এর পর দরকার পড়লে।"

কানন সহজ কৌতুকবোধেই হাসিয়া বলিল কথাগুলা, তটিনী কিন্তু এইখানে মুখটা লইল ফিরাইয়া।

অদ্ভুত লাগে টুলুর, লোকটাকে ক্ষমা করা উচিত নয়, তবু এই জ্যোৎস্না-তরল রাত্রিটার মধ্যে, এই অন্তরঙ্গ গল্পের মধ্যে, এই যেন নিঃশব্দে ভাসিয়া যাওয়ার

মধ্যে কি একটা আছে, যাহার জন্য অতি সহজেই ক্ষমা করিতে পারিল ও।—নারী জিতিবে পুরুষ হারিবে, নারীর সৌন্দর্যের কাছে পুরুষের বর্বর স্বার্থবোধ শিথিল হইয়া গিয়া শিভ্যাল্‌রির নামে সেই বর্বরতা অন্যরূপে জাগিয়া উঠিবে—এর চেয়ে সহজ, সরল, সার্বভৌম সত্য টুলুর কাছে আজ যেন আর কিছুই নাই। মনে একটি প্রশ্ন, এতটুকু দ্বিধা জাগিল না। এই ইতিহাসেরই নিজের দিকের অধ্যায়টাও বলিল টুলু—দারোগার সহিত বোঝাপাড়ার কাহিনীটা—হাসির মধ্যে সুমিষ্ট টিপ্পনী দিয়া।...গঞ্জডিহিতে কাঞ্চনতলায় মাস্টারমহাশয়কে প্রথম দেখা থেকে আজ পর্যন্ত এতগুলা রাত্রিদিনের মধ্যে আজকের রাত্রিটি বড় যেন আলাদা, বড় যেন উদার, মুক্ত, নিঃসঙ্কোচ...

অন্য গল্পও হইল; কাল টুলু এই পথ দিয়াই এই সময় একলা আসিতেছিল—একই পথ, কাল একলা আসা আর আজ তিনজনে গল্প করিতে করিতে যাওয়া যে তাহার অদ্ভুত লাগিতেছে—এই অতি-সামান্য কথাটাও কেন যেন কি উদ্দেশ্যে বলিয়া ফেলিল,—আজ কথা কওয়াতেই যেন একটা মাধুর্য পাওয়া যাইতেছে, যতই তুচ্ছ ততই যেন আরও মধুর।

মাঝে মাঝে নামিয়া তিনজনে হাঁটিয়াও আসিতে লাগিল, রাত্রিটিকে যেন সর্বাঙ্গ দিয়া মাখিয়া লইতে ইচ্ছা হইতেছে।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমে আসিয়া পড়িল, দরজায় করাঘাত করিয়া বলিল—"হীরাবাবু, কপাট খোল, দেখ কারা এসেছেন।"

১৬

ধীরে ধীরে চারিদিকে একটা শুভ পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাইতে লাগিল। ঘটনার বিবরণ ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—জেলার কোণে কোণে, ক্রমে জেলার বাহিরে; আর চাপিতে না পারার জন্যই হোক বা যে জন্যেই হোক গবর্নমেণ্ট খবরটা প্রকাশের অনুমতি দিয়াছে, কলিকাতার

রুদ্ধকণ্ঠ দৈনিকগুলা মুখর হইয়া উঠিয়াছে, কাউন্সিলের সদস্যরা অনুসন্ধানে আসিতেছেন, দেশময় সাড়া পড়িয়া গেছে, রিলিফ পার্টিরা ছাড়পত্র পাইয়াছে। গবর্নমেণ্টের গূঢ় সঙ্কেত আছেই, বৃটিশের সঙ্গে তাহার চরম দোস্তি এখন, তবু কাজ হইতেছে।

আশ্রমের সমস্যাও হালকা হইয়া উঠিতেছে। চাল-ডালের দুর্ভাবনা তো না-ই, বরং আশ্রমের সুনামের জন্য অনেক কেন্দ্র হইতে উপযাচক হইয়া পাঠাইয়া দিতেছে; অধিকন্তু টাকা আসিতেছে, দুর্গতদের অন্য প্রকারেও সাহায্য দেওয়া সম্ভব হইতেছে, সেবায় আসিয়াছে একটা আনন্দ।···অবস্থার আরও উন্নতি হইল, বন্যাপীড়িত অঞ্চলে পুনর্বসতির ব্যবস্থা আরম্ভ হইল, বাহিরের রিলিফ পার্টিরা করিতেছে, জনমত প্রবল হইয়া ওঠায় গবর্নমেণ্টকেও অন্তত লোক-দেখানি কিছু কিছু করিতে হইতেছে। আশ্রমের দুর্গত সংখ্যা অনেক কমিল, নরোত্তমের আন্দাজ অনুযায়ী এক সময় দুই শতের ওপরে গিয়াছিল, ক্রমে পঞ্চাশ-ষাটে আসিয়া দাঁড়াইল। থাকিয়া গেল তাহারাই, যাহাদের শুধু ঘর-বাড়ি খেত-খামারই যাই নাই, আত্মীয়-স্বজনের দিক দিয়াও সব মুছিয়া মিটিয়া গেছে—জন্মভিটা হইয়া পড়িয়াছে বিষ। ইহাদের জমিজমা দিয়া ধীরে ধীরে এইখানেই বসবাস করাইবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। অনেকে আশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াও এখানে থাকিয়া গেল।

প্রায় মাসাবধি একটা নিদারুণ উদ্বেগ আর অমানুষিক পরিশ্রমের পর আশ্রমের জীবনটি আবার থিতাইয়া আসিল ধীরে ধীরে। স্কুল চলিল, চরখা ঘুরিল, তাঁতের ঘরে মাকুর খটখটানি জাগিয়া উঠিল, বোধ হয় একটা দুরতিক্রম্য বাধা-বিঘ্নের পর বলিয়া ভালই লাগিল টুলুর এবার।

কংগ্রেস-পতাকার নিচে হীরার দলও আবার নব উদ্যমে যুদ্ধ-বিগ্রহে উঠিল মাতিয়া। দাদুর মত এক সঙ্গী পাইয়াছে, বয়সে নয়—উৎসাহে; কানন। ঝঞ্ঝা প্লাবন দুর্ভিক্ষ লইয়াই যে কী চমৎকার খেলা সব রচনা করিয়া দিয়াছে, কত নূতন ছড়াই যে দিয়াছে শিখাইয়া, আর কত ভালই যে বাসে হীরাকে আর

হীরার দলকে! হীরা তো কাননকাকার নিত্য সঙ্গী হইয়া পড়িয়াছে, কাছে না থাকিলে কেমন যেন জোড়-ভাঙা বোধ হয়, চম্পা প্রশ্ন করে—"ও কানন, তোমার ছায়াকে কোথায় ফেলে এলে ভাই ?"

একটা জিনিস কিন্তু চোখে পড়ে মাঝে মাঝে,—থাকিয়া থাকিয়া হীরা যেন একটু বিষণ্ণ হইয়া পড়ে, বিশেষ করিয়া কোন কারণে যখন একা পড়িয়া যায়। এক-একবার মনে হয় খেলার মধ্যে অন্যমনস্ক হইয়া গিয়া যেন নিঃসঙ্গতা খুঁজিতেছে।

সবচেয়ে পরিবর্তন হইয়াছে চম্পার। তটিনী আর কানন দুজনেরই স্কুল আর কলেজ এখন পূজার জন্য বন্ধ, কাজ করিবার জন্য আশ্রমে আসিয়াছিল, থাকিয়া গেছে।...হীরার রাগ-অভিমান ভাঙোনোর প্রসঙ্গে চম্পা টুলুকে একদিন বলিয়াছিল—"হীরাবাবুকে কি ব'লে ঠাণ্ডা করলাম জানেন ?—শোনা দরকার আপনার। বললাম—আর একজন ভাল মায়ের ব্যবস্থা ক'রে দোব।"...তটিনীকে লক্ষ্য করিয়াই বলা। আসলে এ ঘটকালির জন্য চম্পার মন প্রকৃতই কতটা প্রস্তুত ছিল বলা শক্ত, তবে তটিনী আসিয়াই একটি সহজ সম্বন্ধের স্থান বাছিয়া লইল। হয়তো তটিনীর স্বভাবই ঐ রকম, কিংবা চম্পার সীমন্তের সিন্দূরই বোধ হয় ওর মনের গতি নির্দিষ্ট করিয়া থাকিবে, নিতান্তই সহজভাবে চম্পার সঙ্গে ওর ননদ-ভাজের সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গেল।...চম্পার এখন ভরা সংসার—ছেলে, ননদ, দেওর, স্বামী—অন্তত পাঁচজনের চোখে তো তাই ; কী নাই ওর ?

চম্পার আরও পরিবর্তন এই জন্য যে, তটিনী আর কানন আসিয়া টুলুর যেন আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়া দিয়াছে। এই মাসখানেকের উদ্বেগ দুশ্চিন্তা তো আপনি গেছেই অবস্থার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, এর আগেও মাস্টারমশাইয়ের চিঠি পাওয়া অবধি ওর দৃষ্টিতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে একটা হিংস্র চক্রান্তের জ্বালা ফুটিয়া উঠিতেছিল সেটা পর্যন্ত নাই আর। চম্পার জীবনে এইটিই ছিল সব চেয়ে বড় বিভীষিকা।...শুধু তাহাই নয়, মাস্টারমশাইয়ের চিঠি পাওয়ার আগেও ছিল জীবনের ক্লান্তি তথা গ্লানির জের কিংবা আশ্রমের ছোটখাট দিনগত সমস্যার

জন্যও যে একটা ছায়া পড়িয়া থাকিত মুখের উপর—প্রায় সর্বক্ষণেই, সেটুকু পর্যন্ত যেন কাটিয়া গিয়া টুলুর দৃষ্টিটা হইয়া উঠিয়াছে স্বচ্ছ প্রসন্ন; কোন সময়েই ওর দিকে আর ভয়ে ভয়ে চাহিতে হয় না। এক এইটুকুর জন্যই কতগুণ স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিয়াছে চম্পার জীবন।

কাজে টুলুর যেন উৎসাহ বাড়িয়াছে। সেটা বিশৃঙ্খলার পর যে এই শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিয়াছে, কতকটা এই জন্য নিশ্চয়, তবে সমস্তটা নয়, আরও কিছু আছে কোথাও। কাজে ডুবিয়া থাকে; চম্পা, তটিনী, কাননকে ডাকিয়া কতরকম প্ল্যান করে। নরোত্তমকে ডাকিয়া লয়—ঝড়-ঝঞ্ঝার হিড়িকে আরও গোটা তিনেক টানা চালা তুলিতে হইয়াছিল, এখন তাহার দুইটাও আশ্রমে আসিয়া গেছে—আরও তাঁত বসিয়াছে, চরখার সংখ্যা বাড়িয়াছে, লোকের অভাবে আর সময়ের অভাবে ছেলে-মেয়েদের পুরা স্কুল করা যাইত না, এখন একটা চালা ওদের জন্য আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তটিনী আর কাননে মিলিয়ে পড়ায়।

যত পরামর্শ যত প্ল্যান সব এই ধরনের কাজ লইয়া, এই শান্তি-আশ্রমকেই শান্তিতে, শ্রীতে, সৌষ্ঠভে পূর্ণতর করিয়া তোলা—কলিটিকে রস দিয়া, উত্তাপ দিয়া ভাল করিয়া ফোটানো—একটি পূর্ণবিকশিত পুষ্পে।

মাস্টারমশাইয়ের চিঠি চাপা পড়িয়া যাইতেছে, ক্রমেই নিচে—আরও নিচে। চম্পা হয় খুশি।

কিন্তু চম্পা যে পরিমাণে হয় খুশি, আর একজন ঠিক সেই পরিমাণে হয় নিরাশ—সে নরোত্তম।

টুলুর মনের কপাটে টোকা মারে, যে অমন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল, সে শুধু নিদ্রিতই রহিয়াছে, না, একেবারে মৃত?

সুযোগ পায় কম, তবু দক্ষিণের গল্প করে মাঝে মাঝে—ও হাসপাতাল হইতে সোজা সেই দিকেই গিয়াছিল সেবারে, তাই ফিরিতে দেরি হয়,—এদিকের সর্বনাশে সেদিকের সর্বনাশে, এদিকের অত্যাচারে সেদিকের অত্যাচারে তুলনাই হয় না।

টুলু শোনে, বিচলিত হয়, তবে আবার জুড়াইয়া যাইতে দেরি হয় না। নরোত্তম যখন একলা থাকে, ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে,—অনেক দেখিল বলিয়া—মনে ঘাটা পড়িয়া গেল নাকি টুলুর? না, আরও কিছু?

একদিন টুলুকে বলিল—"এখন বাইরের মা-মণি আর কানন-ভাই রয়েছেন, হাঙ্গামাও কমেছে এদিকে, একবার দক্ষিণের দিকে ঘুরে আসবেন চলুন না।"

বর্ণনা শোনায় হইতেছে না, নিজের চোখে দেখায় যদি-বা হয় একটু ফল। টুলু একটু হাসিয়া উত্তর করিল—"তুমি ঠিক উল্‌টো বললে যে নরোত্তম, ও বেচারা এসেছে দুদিনের জন্য। দরদ দিয়ে খাটছে ব'লে ওদের ঘাড়ে চাপিয়ে চ'লে যাওয়াই কি উচিত হবে এই সময়?"

বহুদর্শী নরোত্তম আবার একান্তে গিয়া ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়িল—না, কিছু বুঝিতে পারা যাইতেছে না!

কিন্তু নরোত্তম যাই ভাবুক, চম্পা বাঁচিয়াছে।

চম্পার জীবন-তরী ভরা পালে তর-তর করিয়া ভাসিয়া চলিল। ও-ও যেন আরও মাতিয়া উঠিল কাজে, আশ্রমের কাজ বাড়িয়া গেছে, তাহার উপর আগের চেয়েও আরও বেশি করিয়া নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিল সেবার কাজে—ঘরে ঘরে যেন খুঁজিয়া বেড়ায় কোথায় কি একটু ত্রুটি আছে, ব্যথা আছে। ওর পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে থেকে কিসে ওকে যেন ঠেলিয়া চারিদিকে উৎসারিত করিয়া দিতেছে—কোথাও কোন বেদনা থাকিতে দিবে না চম্পা, সব ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া না দিতে পারিলে যেন বাঁচিতেছে না।

আনন্দের ক্লান্তির মধ্যেই হয়তো কখন আসে অবসাদ, মন অন্তর্মুখী হইয়া পড়ে।...এই কি ওর স্বপ্ন ছিল জীবনে?...এর চেয়ে কি আরও বড় কথা ভাবিত না কখনও? এর চেয়ে কি বড় আশীর্বাদ ছিল না তাহার?...প্রশ্নগুলা মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিবার আগেই চম্পা জোর করিয়াই মিলাইয়া দেয়। চম্পা আনন্দের মধ্যে আর খাদ আসিতে দিবে না; বাঁচা চলে কি পদে পদে অত প্রশ্ন করিয়া?

কিন্তু, সত্যই কি ওর আনন্দ নিখাদ ?

একদিন একটি সামান্য ঘটনা চম্পার দৃষ্টিতে অসামান্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়া এই প্রশ্নের যেন উত্তর খুঁজিতে লাগিল।

টুলুর পরিবর্তনের আর একটা দিক—ও যেন জীবনকে আজকাল একটু পরিপূর্ণ ভাবে পাইতে চায়। কাননের সাহচর্যেই বোধ হয় এটা হইয়াছে, ওর সঙ্গে কাব্য, সাহিত্য লইয়া আজকাল প্রায়ই ওর আলাপ হয়, কলেজে শিক্ষার অনুপাতে এদিকে বেশ একটু গভীরতা আছে কাননের, কতকগুলি নিত্যসঙ্গী বই সঙ্গেও আনিয়াছিল—ইংরাজি-বাংলা দু রকমই। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর এটা আরও জমে—তটিনী থাকে, চম্পা থাকে। চম্পার জানা কম, তবে সূক্ষ্ম অনুভূতির জন্য আর রসবোধের জন্য আটকায় না, আলোচনায় রাত গভীর হইয়া ওঠে। এর ওপর টুলুর একটু বেড়ানোর শখ হইয়াছে। বিকেলের দিকে কাননকে লইয়া বাহির হইয়া পড়ে, সঙ্গে থাকে হীরা। মাঠ, পথ, নদীর ধার—সবখান থেকেই পায় পায় কি যেন একটি আনন্দ সঞ্চারিত হইয়া উঠে আজকাল।

নদীতে আজকাল জল বেশ। একটা নৌকাও যোগাড় হইয়াছে কাননের আগ্রহে এবং নরোত্তমের চেষ্টায়, ইদানিং জলবিহারই হয় বেশি, দাঁড়ের সাহায্যে উজান বেয়ে বহুদূর চলিয়া যায়, তাহার পর শুধু হালটুকু ধরিয়া স্রোতের বেগে নামিয়া আসে। কোনদিন স্রোতের মুখেই ছাড়িয়া বাহির হইয়া আরও দূর ; কাহাকেও সঙ্গে লয়, সে নৌকাটা দাঁড় বেয়ে আনে। নিজেরা ডাঙার পথে হাঁটিয়া চলিয়া আসে। একটা নেশার মত হইয়া গেছে। রাত্রের মজলিস এই আলোচনাতেই হইয়া উঠে মুখর।

একদিন চম্পা একবার তটিনীর দিকে আড়ে চাহিয়া লইয়া টুলুকে বলিল—"তোমরা নৌকোর গল্প ক'রো না ; দিদি বলছিলেন—গল্প শুনেই তো পেট ভরে না।"

তটিনী মিথ্যা করিয়াই একটু হাসিয়া বলিল—"বাঃ রে ! কবে বললাম, কোথায় ?"

টুলু আগ্রহের সহিত বলিল—"বেশ তো, চল না তোমরাও একদিন—রোজই যেতে পার, দোষ দেখি নে তো···"

চম্পা ভয়ে যেন শিহরিয়া শরীরটা একটু গুটাইয়া লইয়া বলিল—"ওমা, 'তোমরাও' মানে! আমি যেতে পারব না; দিদি একলা যাবেন।"

"উনি তো যাবেনই, তোমার আপত্তিটা কিসের? নৌকাটা ভালই···"···

"আপত্তি···বাড়ির ঝিউড়ি মেয়ের সব মানায়—ভাইয়ের বাড়ি এসে ঘোরা-ঘুরি, লাফালাফি···কিন্তু···"

একটু হাসিল তটিনীর দিকে ঘুরিয়া।

তটিনীও হাসিয়া বলিল—"ও! আর যারা বাড়ির বউভাজ, তারা বড্ড নিরীহ!"

চম্পার মুখের আলোটা যেন দপ করিয়া নিবিয়া গেল। সেকেণ্ড কয়েক যেন একটা কি রকম অপ্রতিভ ভাব ছাইয়া রহিল, সেটুকু সামলাইয়া লইবার জন্যই টুলু হাসিয়া বলিল—"অন্তত এটা তো ঠিক যে বোনেরা এলে ভাজেরা হয়ই একটু সাবধান। আপনিই চলুন না হয় একলা।"

চম্পা একটু রাঙিয়া উঠিল, একবার চেষ্টা সত্ত্বেও দৃষ্টিটা টুলুর মুখের উপর গিয়া পড়িল, তাহার পর তটিনীর দিকে চাহিয়া বলিল—"বেশ, আপনি একবার ঘুরে আসুন, আপনার ওপর দিয়েই ভয় ভাঙাটা হয়ে যাক। তারপর যাব।"

গেল না চম্পা। কানন আর হীরাকে লইয়া চারজন হইল। আর দুইজন লোক লইল টুলু দাঁড় ঠেলিবার জন্য। উজানের দিকটাই নদীটা বেশি আঁকিয়া বাঁকিয়া আসিয়াছে, দৃশ্যটি ভাল, সেই দিকেই যাত্রা করিল।

গেলও অনেক দূর আজ। ফিরিতে দেরি হইতে লাগিল। সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়া নূতন শুক্লপক্ষের চাঁদটা যখন আকাশে স্পষ্ট হইয়া উঠিল, চম্পা একটু উদ্বিগ্ন হইয়াই নদীর ধারে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল নৌকাটা আসিতেছে।

চারজনে মুখামুখি হইয়া বসিয়া আছে, কাননের কোলের কাছে হীরা। তটিনী বোধ হয় গল্প করিতেই জলের দিকে ঝুঁকিয়া নিজের ডান হাতটা খেলা-

চ্ছলে জলে একটু ডুবাইয়া দিতে টুলু বোধ হয় কিছু বলিল, তটিনী হাসিয়া একটু মুখটা তুলিতে তাহার খানিকটা জোৎস্নায় স্পষ্ট হইয়া উঠিল, তটিনী কিন্তু যেন অবাধ্য ভাবেই হাতটা ডুবাইয়াই রহিল জলে।

চম্পার মনটা হঠাৎ মোচড় দিয়া উঠিল।...ঘরে একটা হাতের কাজ ফেলিয়া আসিয়াছিল, এরা যখন আসিয়া গেছে, চলিয়া যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু পা যেন উঠিতে চাহিল না।...নিজের মনকে চম্পা দাবের মধ্যেই রাখে, অনুভূতিটা চেষ্টা করিয়া চাপা দিয়া দিল...অন্যায় এমন ভাব...

নৌকাটা আসিয়া পড়িল। একেবারে ধারে লাগাইল। একটা গাছের গুঁড়ি আছে জলের মধ্যে, শুকনো ডাঙা থেকে হাত দুয়েক তফাতে, সেইটার উপর পা দিয়া টুলু আর কানন লাফাইয়া আসিল। দাঁড়ীদের মধ্যে একজন হীরাকে কোলে করিয়া আনিয়া দিল।

বাকি রহিল তটিনী। গুঁড়িটার উপর উঠিয়া সে যেন থতমত খাইয়া গেল। একেবারেই কাছে ছিল টুলু, একটু হাতটা বাড়াইয়া দিলেই তটিনী বোধ হয় ওটুকু ডিঙাইয়া লয়, কিন্তু সেও যেন স্ট্যাচুর মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সামান্য কয়েকটি মুহূর্ত, বাতাসটা যেন কি রকম হইয়া গেছে। চম্পার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—একদিন পথের মাঝে তাহার আঁচলটা নিঃসঙ্কোচে তুলিয়া হাতে ধরিয়া দিয়াছিল—এই টুলুই না?...তবে আজ কেন এ সঙ্কোচ?...

একটা মোক্ষম ঠাট্টা করিয়া বসিল—"এ কি! বোনের হাত ধ'রে ভাই নামাবে—সামনেই রয়েছ, ভাই বোন দুজনেই কাঠ হয়ে গেলে?..."

তাড়াতাড়ি নিজেই নামিয়া গিয়া তটিনীকে হাতটা বাড়াইয়া দিল এবং তাহার পরই প্রশ্নে প্রশ্নে, হাসিতে গল্পে ঠাট্টায় লজ্জাটা একেবারে চাপা দিয়া দিল।

১৭

এই ব্যাপারটুকুর পর থেকেই চম্পার দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিল চম্পা, ঠাট্টাটুকুতে টুলুর কিছুক্ষণ পর্যন্ত একটু জড়িমা লাগিয়া থাকিলেও, তটিনীর কথাবার্তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার সহজ আর মুক্ত হইয়া উঠিল, যেন ভাজের স্ববাদ যাহার সঙ্গে, সে স্বযোগ পাইলেই ভাই-বোন লইয়া ঠাট্টা করিবে, এর আর হইয়াছে কি?···আরও যেন ভাল লাগিল তটিনীকে, আর সেটা শুধু এই জন্যই নয় যে ওর দিক দিয়া তটিনী নিশ্চিন্ত রাখিল চম্পাকে, ওর চরিত্রের স্বচ্ছতা ওকে মুগ্ধ করিল।

তবু মেয়েছেলেরই মন তো—চিন্তার কারণ না থাকিলেও একেবারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে কই? চোখ দুইটা খুলিয়া রাখিতে হইল, তবে না-জানিতে দেবার ক্ষমতাটা খুব আয়ত্ত বলিয়া টের পাইল না কেহই—না টুলু, না তটিনী।

ছুটি ফুরাইয়া আসিল। কাননের দিন সাতেক আগেই খুলিবে, সে এই হিসাবে আগে যাইবে—এই রকম মোটামুটি সবার জানা। যাইবার আগের দিন রাত্রে এই প্রসঙ্গেই তটিনী জানাইল, সেও যাইবে। আহারের পরে চারজনের যে মজলিসটা বসে তাহাতেই কথাটা পাড়িল তটিনী।

বিস্মিত হইল চম্পা টুলু দুজনেই, কিন্তু চম্পার এ-ধরনের কথায় বিস্মিত হওয়ারও অতিরিক্ত কাজ আছে, চকিতে একবার টুলুর মুখের পানে চাহিল; দেখিল, বিস্ময়ের সঙ্গে হঠাৎ নৈরাশ্যে মুখটা যেন অন্ধকার হইয়া গেছে।

বলিল—"সে কি! আপনার তো এখনও সাত দিন বাকি, এর মধ্যেই···" চম্পার দিকে ঘুরিয়া বলিল—"শুনছ চম্পা, কালই যাবেন বলছেন উনি!"

"তার জন্যে তো গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বের করা যায় না ওঁর নামে।"

কথাটা কতকটা নির্বিকার ভাবে বলিয়া চম্পা একবার তটিনীর মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল। চম্পার উপরই ভরসা ছিল টুলুর, একটু যেন

নিরুপায় হইয়া চুপ করিয়া গেল, তাহার পর দুর্বল কণ্ঠে বলিল—"সে কথা নয়, তবে করবেন কি গিয়ে এখন ?···তাই বলছি···"

কণ্ঠের এই স্খলন, দৃষ্টির এই সঙ্কোচ, এইটুকুরই দরকার ছিল চম্পার, এর পরই কথাবার্তা বেশ সহজ খাতে নামাইয়া আনিল, নয়তো ওদিকে তটিনীও আবার অন্যরকম ভাবিবে। তাহার দিকেই চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"কথাটার উত্তর দাও দিদি, করবে কি এখুনি গিয়ে ?···এটুকু না হয় বুঝলাম যে, এখানে কষ্ট হচ্ছে।"

তটিনীও হাসিয়া টুলুর দিকে চাহিয়া বলিল—"সোজা কথাটা বলতে জানে না বউ। ওটুকু জুড়ে দেওয়া চাই—কষ্ট হচ্ছে।···আপনিও বোধ হয় তাই বিশ্বাস করলেন ?"

কানন বলিল—"অথচ দিদি বলেন, এখান থেকে যেতে মন চাইছে না কানন। কতবার আমায় বলেছেন।"

তটিনী সমর্থন পাইয়া বলিল—"বল্ ওঁদের সেই কথা।···কী যে ভাল লাগে আমার জায়গাটা !"

এ সুযোগটাও ছাড়িল না চম্পা, তটিনীর মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল—"এ জায়গায় এমন কি মধু আছে বুঝি না তো ; অজ পাঁড়াগাঁ···"

এত বড় প্রত্যক্ষ আঘাতেও তটিনীর মুখের ভাব এতটুকুও বদলাইল না, বেশ সহজ দৃষ্টিতেই চাহিয়া বলিল—"পাড়াগাঁ নাকি মন্দ ? আমার তো শহরের চেয়ে ভালই লাগে বরং···"

কানন অজ্ঞাতসারেই চম্পার কথাটাই আরও স্পষ্ট করিয়া দিল, বলিল—"তার চেয়েও বড় কথা—দিদির অনেকদিন থেকেই ইচ্ছে টুলুদা, এই রকম একটি আশ্রম গড়েন আর উনিও এসে কাজ করেন সেখানে।"

তটিনী চম্পার দিকেই চাহিয়া বলিল—"সে কথা বউ-ই কি জানে না ? কতবার তো ওকে বলেছি, গঞ্জডিহিতে যেদিন প্রথম গিয়ে পড়ি ওঁর স্কুলে, সেদিন-কার কথা।···তার ওপর কত ভাল জায়গাটা গঞ্জডিহির চেয়ে।···আবার তারও

ওপর আছে—গঙ্গডিহিতে কি টের পেয়েছিলাম এর মধ্যেই তুমি রয়েছ, হীরা রয়েছে ?"

চম্পা যেন নিজের কাছেই অপরাধী হইয়া একটু চুপ করিয়া রহিল, যাহার মনে এতটুকু গ্লানির চিহ্নমাত্রও কোথাও নাই তাহার সম্বন্ধে এ কলুষিত সন্দেহটুকু ওর মিটিতেছে না কেন ? নিজের মনের এ পাপকে চম্পা কোথায় রাখে ?··· আপাতত যেন সে পাপের যতটুকু ক্ষালন হয় ততটুকুর জন্যই জিদ ধরিয়া বসিল—থাকিয়া যাইতে হইবে একটা দিন। বলিল—"কিন্তু তোমার কাজে আর কথায় তো মিলছে না দিদি, এত ভাল লাগে বলছ এই সাগরদহ, আমাদের সবাইকেও, অথচ হাতে ছুটি থাকতেও যাচ্ছই তো চ'লে···"

টুলুর পানে চাহিয়া বলিল—"বাঃ, তুমি যে চুপ ক'রে গেলে, আমার দিকে হয়ে বল একটু।"

টুলু বলিল—"আমি হার মেনেই তো ধরলাম তোমায়।"

চম্পা তটিনীর দিকে একটু আড়ে চাহিয়া বলিল—"বেশ, আমি কিন্তু হার মানবার পাত্রী নই দিদি, আমার হাতে যা অস্ত্র আছে সকালবেলা উঠেই দেখতে পাবে···হীরাকে দোব লেলিয়ে, যেও ভাল ক'রে তখন।"

তটিনী হাসিয়া বলিল—"কিন্তু বীরমাতা হওয়ার বিপদের কথা তো জানো না,—ওকে বললেই হবে, ওর দলের জন্যে তাড়াতাড়ি বন্দুক কিনে পাঠাতে যাচ্ছি, ইংরেজদের আসতে আর দেরি নেই।"

এর পরেও অনেকক্ষণ গল্পগুজব হইল ; তটিনীর যাওয়াটা স্থগিতই রহিল এবং এ প্রসঙ্গের পর অন্য প্রসঙ্গ আসিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্তই জাগিয়া রহিল সবাই, কাল থেকে তো কাননকে পাওয়া যাইবে না। চম্পা কিন্তু ক্রমেই যেন স্বল্পবাক হইয়া আসিল। মনের অন্য প্রান্তে গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়া কি যেন ভাবিতেছে। টুলু লক্ষ্য করিল, মাঝে মাঝে মুখটা ওর যেন অতিরিক্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। এই ভাবান্তরটা টুলুর চেনা—মনে মনে কিছু একটা বড় সঙ্কল্প করিলে ওর মুখটা কখনও কখনও এই রকম হইয়া উঠে, ওর ভিতরে যেন আগুন

জ্বলিয়া ওর ভিতরের যত খাদ সেগুলাকে দগ্ধ করে, সেই আগুনেরই হল্‌কা উঠে যাঝে মাছে ঐরকম করিয়া।

অবশ্য কিছু বলিল না টুলু।

মজলিস ভাঙার পরও গল্পের জের চলে খানিকক্ষণ, ও-ঘরে কাননে টুলুতে, এ ঘরে চম্পায় তটিনীতে। আজ কয়েকবারই গল্পের মধ্যে মাত্রার স্খলন লক্ষ্য করিয়া তটিনী বলিল—"বউ, তুমি আজ বড় অন্যমনস্ক রয়েছ ; থেকে তো গেলাম, আবার কি ?"

চম্পা আরও একটু চুপ করিয়া শুইয়াই রহিল, ঘুমন্ত হীবাকে যে বুকে একটু চাপিয়া ধরিল তটিনী সেটা ক্ষীণ আলোয় টের পাইল না, তাহার পর একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—"দিদি, একটা কথা অনেক দিন থেকে জিগ্যেস করব ভাবছি—অপরাধ হয় তাই করি নি—এবার তো চ'লেই যাচ্ছ, কাল, না হয় দুদিন পরে···"

তটিনী বলিল—"এত গৌরচন্দ্রিকার ঘটা কেন ?"

চম্পা আর একটু চুপ থাকিয়া প্রশ্ন করিল—"বলছিলাম এই ভাবেই জীবনটা কাটাবে ?···কেন ?"

"বেশ তো কেটে যাচ্ছে।"

"একে তো বেশ কাটা বলে না···মেয়েছেলের পক্ষে। আর একটু অপরাধ করি তা হ'লে, দোষ নিও না, মেয়েয়, মেয়েই তো কথা হচ্ছে,—এ রকম কাটানোর মধ্যে অনেক সময় একটা ইতিহাস থাকে···সেই রকম বাধা আছে কি কিছু ?···অবিশ্যি যদি বলতে বাধা না থাকে, তা হ'লে···"

তটিনী চুপ করিয়া রহিল।

চম্পা সময় দিল উত্তর দিবার, কেন না যতক্ষণ চুপ করিয়া থাকে তটিনী, ততই বেশি করিয়া অকথিত কথাটা চম্পার কাছে স্পষ্ট হয়। মেয়েরা মেয়ের অনুচ্চারিত ভাষা বুঝিতে পারে, বোধ হয় যত বেশি অনুচ্চারিত ততই বেশি পারে বুঝিতে। এক সময় বলিল—"বললে আমি কাজে লাগতে পারি, তাই জিগ্যেস করলাম, দোষ হ'ল কি না জানি না।"

একটু নীরব থাকার পর তটিনী বলিল—"এমন কিছু বলবার নেই বউ··· ভাই দুটোকে মানুষ করতে হচ্ছে। বাবা মা উপরোউপরি গেলেন, নিজের কথা ভাবলে ভেসে যেত ওরা।"

"এবার তো ওরা মানুষ হয়েছে দিদি, আর নিজের কথা ভাবতে দোষ কি ?"

তটিনী এবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর যেন মন থেকে অনেক-গুলা ব্যাপার চেষ্টা করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল—"আমার নিজের কথা ভাবায় চিরজন্মই দোষ থাকবে বউ—তাতে পরের সর্বনাশ।···ঘুমোও, রাত হয়ে গেছে।"

এর পর চম্পাও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, শেষের কথাগুলার যত বেদনা যেন নিঙড়াইয়া নিঙড়াইয়া পান করিতেছে, যতই করিতেছে ততই যে-সঙ্কল্পটা করিয়াছিল নেশার মত ওর মনটাকে সেটা যেন অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। এক সময় মনস্থির করিয়া ফেলিয়া, হীরাকে যেন শেষবারের মত বুকে চাপিয়া ধরিয়া হাত দুইটা আলগা করিয়া দিল, যেন বিদায় দিল নিজের এই সমস্ত জীবনটারই সঙ্গে ; তটিনীকে বলিল—"বললে না ?···আমার জীবনেও—একটা ইতিহাস আছে দিদি, হুকুম কর তো বলি।"

"কি, বল না।"

"আমি ভেসে বেড়াচ্ছিলাম ; ভাসতে ভাসতে তোমার দাদার পায়ে এসে ঠেকি···অনেক দুঃখের কথা, রাত কাবার হয়ে যাবে শুনতে শুনতে···"

গলাটা হঠাৎ ধরিয়া গেল ; তটিনী বাধা দিয়া বলিল—"পায়ে জায়গা তো পেয়েছ বউ, ঐ পর্যন্তই থাক্। সিদ্ধির কথাই তো আসল কথা, ফল কি তপস্যার কথা শুনে ?"

চম্পা চুপ করিয়া গেল। তটিনীর চিত্তের নির্মলতায় মুগ্ধ হইয়া স্থির করিয়া-ছিল নারী-জীবনের চরম স্বার্থত্যাগ করিবে আজ ; নিজের জীবনের সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইবে, ওর সীমন্তের সিঁদুরের জন্যই যে তটিনীর কঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণ—আর সত্যই তাহা যে কত কঠোর এটা বুঝিতে চম্পার

দেরি হয় নাই, তাহার পর নিঃশব্দতার মাঝে যখন তটিনীর অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখিতে পাইল, তখন ওর সঙ্কল্প হইয়া উঠিল আরও দৃঢ়।

আরম্ভ করিল নিজের জীবনী।

ঈর্ষার কুটিল সন্দেহ থেকে আরম্ভ করিয়া চম্পা নারী-জীবনের চরম মহত্ত্বের একেবারে কাছাকাছি আসিয়া পড়িল।···কিন্তু শেষরক্ষা হইল না। আত্মহত্যার শক্তি অর্জন হয় নাই ওর এখনও; ডুবিয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে তটিনীর শেষের কথাগুলা যেন প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আবার উঠিয়া পড়িল। ঐ পর্যন্তই থাকিয়া গেল কথাটা।

১৮

দিন পাঁচেক পরে তটিনী চলিয়া গেল।

নরোত্তম সপ্তাহখানেক আশ্রমে ছিল না। কাল আসিয়াছে, আসিয়া অবধি ভাবটা অত্যন্ত চনমনে, চুপ করিয়াই থাকে, বেশি কথা কয় না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বড়ই অধৈর্য। ভাবটা টুলুর নজরে পড়িল না, যদিও সাধারণত এর চেয়ে ঢের সূক্ষ্ম বৈলক্ষণ ওর দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। তবে চম্পার নজরে পড়িল, বেশ বুঝিল—গুরুতর কিছু একটা রহস্য বহন করিয়া ফিরিতেছে নরোত্তম, সেটা যে টুলুর জন্যই, এটাও আন্দাজ করিয়া লইল, নরোত্তম সুযোগ খুঁজিতেছে। নিজে হইতেই চম্পাকে বলিল না বলিয়া চম্পাও প্রশ্ন করিল না।

তটিনী গেল সকালে, আহারাদি করিয়া, দিনে দিনে পৌঁছিয়া যাইবে। আশ্রমের কাজকর্ম সারিয়া বিকালে টুলু নৌকায় করিয়া একটু বেড়াইতে গেল; চম্পাকে ডাকিল, কাজ আছে বলিয়া সে কাটাইয়া দিল, সত্য হোক বা মিথ্যাই হোক। সঙ্গী হইল শুধু হীরা। দাঁড় ধরিবার জন্য একটা লোক লইল। ফিরিল সন্ধ্যা হইবার ঢের আগেই। হীরা একটু অনুযোগও করিল, একে আলাপে তেমন সুবিধা হয় নাই আজ, কত প্রশ্নের জবাবই পায় নাই, কত প্রশ্নের জবাব

পাইয়াছে ওলট-পালট করিয়া ; বলিল—"বাবা, তুমি আজ যেন কি হয়েছ, এমন জানলে আমি আসতুম তোমার সঙ্গে—ভালো করে !"

টুলু হাসিয়া বলিল—"কি হয়েছি রে ?"

"আদ্ধেকও বেড়ালে না তো···কিছু দেখা হ'ল না।"

"সেই একই জিনিস রোজ রোজ কি অত দেখবি শুনি ?"

"না যাও, তুমি ভারি দুষ্টু, কাননকাকা থাকলে কাশবনীর বনে কেমন দেশ আবিষ্কার করতে নিয়ে যেত সেদিনকার মতন। বেশ তো, আবার আমায় ডেকো কখনও, আসব ভাল ক'রে !"

একটা বড়গোছের খেলা জমাইয়া ক্ষতিটুকু পোষাইয়া লইবার জন্য নৌকা থেকে লাফাইয়া চলিয়া গেল, তাহার পর জমাইতে না পারিয়া একটা বাজে আবদার ধরিয়া কাজের মধ্যে মায়ের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। চম্পা একবার কতকটা বিদ্রূপ কতকটা দুঃখে নিজের মনেই বলিল—"কেনই যে আসা, ভাই-বোনে বাপ-বেটার অভ্যাস খারাপ ক'রে দিয়ে গেলেন শুধু।···চম্পা ভুগুক এখন।"

নিজের মনটাও তাহার বড় ভার।

হীরা চলিয়া গেলে টুলু উঠিয়া আসিয়া নদীর ধারেই দূর্বাঘাসে ঢাকা একটা জায়গায় বসিল। কিছু যেন ভাল লাগিতেছে না, অথচ কিছু করিতেও ইচ্ছা হইতেছে না, এমন কিছু পাইতেছে না যাহাতে একটু আগ্রহ পায়, একটু নূতনত্ব আছে। তাহার পর হঠাৎ মনে পড়িল—কয়েকদিন বাহিরে কাটাইয়া নরোত্তম ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে তো এখন পর্যন্ত ভাল করিয়া কথা হয় নাই। ফিরিয়া কাহাকেও ওকে ডাকিয়া আনিতে বলিবে, দেখে—বাসার দোরের কাছে হীরাকে কাঁধ থেকে নামাইয়া দিয়া সে নিজেই এই দিকে আসিতেছে। টুলুর হঠাৎ কেমন একটা বিরক্তি ধরিয়া গেল, মুখটা ঘুরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

নরোত্তম বলিল—"আপনি এখানে? আমি ওদিক থেকে এসে বাড়িতে খুঁজতে গেছলাম।"

টুলু বলিল—"নৌকো ক'রে ঘুরতে গেছলাম, ভাল লাগল না, একটু এসেছি এখানে।"

"বাইরের মা-মণি আর তাঁর ভাই চ'লে গেলেন কিনা…"

"বোধ হয় সেই জন্যেই, দুজনে হৈ-হৈ ক'রে ছিল তো।…বিশেষ ক'রে কানন। আমি তোমাকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম। কোথা থেকে ঘুরে এলে? নতুন খবর কিছু আছে নাকি?"

নরোত্তম উত্তর দেবার জন্য মুখ খুলিবার আগেই আবার বলিল—"হ্যাঁ, তার আগে একটা কথা নরোত্তম, তটিনী আর কানন কায়েমীভাবেই এখানে থেকে কাজ করতে চায়। তোমায় বলেছিলাম এ কথা, যা'ওয়ার সময় আরও আগ্রহ প্রকাশ ক'রে গেল। তোমার মতটা কি?"

নরোত্তম একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল—"আপনি নিজেই ঠিক করুন সেটা, একটা নতুন খবর আছে সেটা শুনে নিয়ে।"

"খবরটা কি?"

"তমলুক-কাঁথীর দিকে ওরা আবার খুব তোড়জোড় করছে, শীগ্‌গিরই কিছু একটা হবে, বলছে—এবার হয় এস্‌পার, নয় ওস্‌পার।"

টুলু মুঠায় চিবুকটা চাপিয়া চুপ করিয়া রহিল, নরোত্তম আড়চোখে দেখিল, মুখের নির্বিকার ভাবটা প্রায় বিরক্তির কাছাকাছি। নরোত্তমের মুখটা কঠিন হইয়া উঠিল, তবে বেশ সহজ কণ্ঠেই বলিল—"কাজে কাজেই আবার যা হবে তার কাছে আগস্টের ব্যাপারটা পানসে হয়ে যাবে। জানেন তো পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গের কয়েক জনাই উদিকে কাজ করছে, তাদের ইচ্ছেটা আশ্রমও লাগে এই সঙ্গে। তাই বলছিলাম একেবারে নতুন লোক আর আশ্রমে নেওয়া ঠিক হবে কি?—আপনি ঐ যে বললেন বাইরের মা-মণি আর কানন-ভাইয়ের কথা…।

মুখে বিরক্তির ভাবটা আরও একটু স্পষ্ট হইল বলিয়া টুলু মুখটা একটু ঘুরাইয়া লইল, একটু হাসিয়া বলিল—"আশ্রম আর ও-অঞ্চলের মাঝখানে অনেকটা ফাঁক

প'ড়ে যাচ্ছে না, নরোত্তম ? আমার বলবার উদ্দেশ্য—দক্ষিণ যতটা করেছে বা করবার জন্যে তোয়ের, এদিককার অঞ্চলগুলো ততটা নয় ; এ অবস্থায় দক্ষিণের সঙ্গে যোগ রেখে কাজ করতে গেলে আমরা নেহাৎ একা প'ড়ে যাব না ? বাইরের লোক—তুমি যেমন বলছ—না-ই নিলাম—এতই যখন অবিশ্বাস।"

শেষের কথাটিতে ব্যঙ্গ বেশ একটু রূঢ়ভাবেই ফুটিয়া উঠিল।

নরোত্তম বেশ সূক্ষ্ম ব্যঙ্গেই উত্তর দিল—"অবিশ্বাস নয়—বাবাঠাকুর, তবে কাঁচা লোকের মতিস্থির থাকে না তো, আজ বলছে এক রকম, কাল বলবে অন্য রকম। তা ভিন্ন কথা হচ্ছে আমাদের আশ্রমের সুনাম রয়েছে, কথাগুলো চাপাচুপি রেখে যেতে পারলে কাজ আমরা খুব বেশি করতে পারব। নতুন লোক কি পারবে তা ?"

একটু ক্ষান্তি দিয়াই অনেক দিনের পোষা মন্তব্যটা প্রকাশ করিয়া ফেলিল—"একজন আবার মেয়েছেলে কিনা তার মধ্যে।"

টুলু একটু অসহিষ্ণুভাবেই বলিল—"ও-অপবাদ কেন নরোত্তম ? আগস্টের ব্যাপারে দক্ষিণে মেয়েছেলেও তো ছিল—বুকে গুলি নিয়ে মরেছে…"

একটুও দেরি হইল না নরোত্তমের উত্তরটা দিতে, বলিল—"তারা সব অন্য জেতেরই মেয়েছেলে বাবাঠাকুর…"

সঙ্গে সঙ্গেই একটু নরম করিয়া দিয়া বলিল—"তাদের টেনিং কতদিনের টেনিং …সেই কথা বলছি।"

খানিকক্ষণ একেবারে নিঃশব্দে কাটিল। তাহার পর নরোত্তমই বলিল—"মাঝখেনের জায়গাগুলোর কথা যা বলছিলেন, আমি কয়েকটা কেন্দ্র ঘুরে এসেছি, তারা তোয়ের আছে, অবিশ্যি দক্ষিণের ওদের মতন নয়, খাটতে হবে একটু। তাদের নিজের ওপর সরকারের নজর বড্ড বেশি ব'লে আমাদের ওপরই বেশি ভরসা।…"

আবার একটু চুপচাপ গেল। তাহার পর টুলু বলিল—"তবে তোমায় আসল কথাটাই বলি নরোত্তম, আমার মত নয় আর এসব ব্যাপারে থাকা।

তুমি বোধ হয় বলবে, আমি কাঁচা লোক, মতিস্থির নেই, কাল যা বলেছি আজ তা উলটে দিচ্ছি, কিন্তু ওলটাবার কারণ হয়েছে এর মধ্যে।"

প্রশ্নের অপেক্ষায় একবার অপাঙ্গে দেখিয়া লইয়া বলিল—"এই যে একটা দুর্বিপাক গেল—ঝড়, বন্যে, দুর্ভিক্ষ, মহামারী,—এতে শেষ পর্যন্ত তাদের হাত পাততে হ'ল কাদের কাছে ভেবে দেখ। ঝড় বন্যেটা দৈব, এরকম ভাবে আর নাও হতে পারে, কিন্তু একটা ভীষণ দুর্ভিক্ষ যে আসছেই—এটা দেশের অবস্থা দেখে একটা শিশুও ব'লে দিতে পারে, আর দুর্ভিক্ষ এলেই মহামারী কেউ রুখতে পারবে না। তা হ'লে ফের তো আমাদের ঐ গভর্মেণ্টের কাছেই হাত পেতে দাঁড়াতে হবে? লোকগুলোকে আগে বাঁচাতে হবে, তার পরে তো স্বাধীনতা নরোত্তম? তুমি বলবে—কি ফল হ'ল হাত পেতে? দিলে কি গভর্মেণ্ট?··· ঠিক কথা, তবে একেবারে খালি হাতেও তো বিদায় করে নি, খেদিয়ে দেয় নি তো। ভবিষ্যতের পথটুকু তো খোলা আছে? কেন, ঐ সুনামের জন্যেই নয় কি?"

নরোত্তম যেন একটু নরম হইয়া একটা কাঠি দিয়া মাটি আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলিল—"বাবাঠাকুর, আমরা অজ্ঞ গেঁয়ো লোক, মানায় না আপনাদের সঙ্গে তক্ক করা, তবে একটা কথা বিচার ক'রে দেখুন—উদ্দেশ্য কি ওদের এই নয় যে, ওরা চিরকালই আকাল-মহামারী লাগিয়ে রাখুক, আর আমরা চিরকালই হাত পেতে রাখি ওদের সামনে? এদের রাজত্বের কাহিনীটা গোড়া থেকে মিলিয়ে যান না—সেই কোম্পানির আমল থেকে—ছোট-বড় কত দুর্ভিক্ষই গেল হিসেব ক'রে দেখুন না—রোজকার দুর্ভিক্ষ রোগ মহামারী, যেটা গা-সওয়া হয়ে গেছে সেটার কথা ধরলাম না আর।"

একটু বিস্মিত হইয়াই টুলুকে নরোত্তমের মুখের পানে চাহিতে হইল। কিন্তু এক সময় যাহাতে হয়তো প্রশংসার ভাবই আসিত, মেজাজের অবস্থায় তাহাতে ভিতরে ভিতরে আরও বিরক্তি আসিল; বলিল—"বেশ, এর প্রতিকারে করছ কি তোমরা?"

"আমি তো এখানেই।"

"ওদের কথাই জিগ্যেস করছি।"

"বললাম তো—এবারে খুব বড় তোড়জোড় হচ্ছে।"

"যেমন ?"

"এবার ওরা গোড়া থেকে শুরু করছে, নিজেদের আইন, আদালত, পুলিস, ট্যাক্স..."

টুলু বাধা দিয়া একটু ঠোঁটের কোণে হাসিয়া বলিল—"প্যারালাল গভর্মেণ্ট—এবার খেলাঘর পাতা হচ্ছে!...রাজ্য রক্ষার জন্যে ফৌজ চাই নরোত্তম, আবেদন-নিবেদনে রক্ষা হবে না তো ?"

"তার ব্যবস্থাও হচ্ছে। আবেদন-নিবেদনে যে আর বিশ্বাস করে না সেটা তো দেখালে ওরা। প্রাণ দিয়েছে, দরকার পড়লে এবার নেবে। পণ্ডিতমশাই আগে নেবার মন্তরই দিয়ে গেছেন ব'লে তাঁর সাকরেদের কাছে অনেক আশা ক'রে ব'লে পাঠিয়েছে তারা।"

কথাটা যেন নরোত্তমের শেষ কথা,—শ্লেষও আছে, রূঢ়তাও আছে, আবার মিনতি-আবেদনও আছে। একসঙ্গে সবগুলা লাগিল টুলুর অন্তরে, বিশেষ করিয়া—'তাঁর সাকরেদের' কথা দুইটি। একবার অন্যভাবেই মুখ তুলিয়া চাহিল; পরক্ষণেই কিন্তু যেন নিজের মতের দৃঢ়তাটুকু বজায় রাখিবার জন্য বলিল—"আচ্ছা, পাতুক খেলাঘর, একটু দেখি নরোত্তম।"

বুঝিয়াও বিরক্তিটাকে কোনমতেই যেন মন থেকে সরাইতে পারিতেছে না; মুখটা ভাল ভাবেই ঘুরাইয়া বসিয়া রহিল। একটু পরে হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল—চম্পাকে টানিলে হয় এর মধ্যে, ওর সমর্থন পাইবেই; দেখিতেও একটু ভাল হইবে। ঘুরিয়া তাহাকেই ডাকিয়া আনিতে বলিবে—দেখে, নরোত্তম কখন্ নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেছে।

ধক্ করিয়া একটা ভয়ানক চোট লাগিল টুলুর বুকে।—সেই ধরনের একটা প্রচণ্ড আঘাত, যাহাতে অনেক সময় হঠাৎ মনের কতদিনের পুঞ্জীভূত অন্ধকারে

আলোকের সংঘর্ষ জাগিয়া উঠিয়া দৃষ্টিকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করিয়া দেয়।... টুলুর ভ্রূ দুইটা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—সে এতক্ষণ নরোত্তমের সঙ্গে কি সব যেন তর্ক করিতেছিল না? চঞ্চলভাবে কতকটা অকারণে উঠিয়া পড়িল টুলু, তাহার পর আবার কি ভাবিয়া বসিয়া পড়িয়া তর্কটা আগাগোড়া মনে করিবার চেষ্টা করিল। ...নরোত্তম বাহিরে অর্থাৎ দক্ষিণ অঞ্চলে ঘুরিয়া খবর সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে—আরও বড় বিদ্রোহের সরঞ্জাম চলিতেছে ওদিকে—জলোচ্ছ্বাস-দুর্ভিক্ষ-মহামারীর পটভূমিতে অনাত্মীয় বিদেশী সরকারের নৃশংস রূপটা নিজের বীভৎসতায় আরও প্রকট হইয়া পড়িয়াছে—জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে—এবারে একেবারেই একটা চরম নিষ্পত্তি,—হয় ভাল করিয়া বাঁচিবে, নয়তো ভাল করিয়া মরিবে।... টুলু এই বিরাট জাগরণ-প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করিয়া গেল—আগাগোড়া...কেন?

সে-ই না সেদিন আশ্রমের শান্তভাব লইয়া নরোত্তমকে অমন চোখা চোখা কথা দিয়াছিল শোনাইয়া, যাহার ফলে নরোত্তমের এই স্বরূপে প্রকাশ? এ কয়টা দিনের মধ্যে কী এমন হইয়াছে যাহার জন্য তাহার এই অদ্ভুত রূপান্তর? নূতন কি এমন হইল?

টুলু চুপ করিয়া বসিয়া নিজের মনের মধ্যে যেন তলাইয়া যাইতে লাগিল, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল, আকাশে শুকতারা ফুটিল এবং সমস্তটুকুর কারুণ্যের সঙ্গে যেন এক হইয়া একটি মুখ ধীরে ধীরে তাহার মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

—তটিনীর মুখ। টুলু যেন হঠাৎ একটা নূতন আবিষ্কারের বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। এ ধরনের অনুভূতি একেবারেই নূতন তাহার জীবনে। মনটা তাহার বহুদূর পর্যন্ত চলিয়া গেল, সেই সন্ধ্যাটিতে ঝটিকা-বিক্ষিপ্ত পক্ষীটির মতই তটিনী সেই যে দুর্যোগের সন্ধ্যায় তাহার আশ্রয়ে—নিতান্তই তাহার পাশটিতে আসিয়া পড়িয়াছিল। টুলু আজ বুঝিল, সেদিন তাহার জীবনেও একটা বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। মিলাইয়া দেখিল সেই থেকে তটিনীর চিন্তায় বরাবরই একটা মাদকতা ছিল। কিন্তু এমনই অদ্ভুত এই মাদকতা যে, যখন ছিল, বেশ সচেতনভাবে তো বুঝিতে দেয় নাই!...কতকটা মাস্টারমশাইয়ের প্রভাবে, কতকটা এই

বয়সে জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতালাভের জন্য টুলুর আত্মবিশ্লেষণের ক্ষমতাটা বেশ আয়ত্ত, যেন নিজের থেকে আলাদা হইয়া নিজের গতিবিধি, নিজের মনের খুঁটিনাটি লক্ষ্য করিবার বেশ ক্ষমতা আছে, অভ্যাসও আছে। কিন্তু আশ্চর্য, এই একটি ব্যাপার যেন তাহার সতর্কতাকে ফাঁকি দিয়া ঘটিয়া গেল তাহার জীবনে; তটিনী তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে দেখার সেই প্রথম মুহূর্ত থেকেই, কিন্তু আজ পর্যন্ত তো জানিতে দেয় নাই, সে আকর্ষণের মধ্যে এ রকম একটা ঘুমপাড়ানো যাদুশক্তি ছিল।

টুলু নিজের মনটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল। নারীর সঙ্গে একটা অদ্ভুত সম্বন্ধের আস্বাদ, টুলুর জীবনে এই প্রথম—কত নিবিড়, কত অশ্রু-জলে গলা, কত মধুর, কিন্তু কত সর্বনাশাভাবে মধুর! আজ সে তটিনী থেকে দূরে বলিয়াই সমস্তটা স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছে। বুঝিতেছে, তটিনী নাই বলিয়াই তাহার সন্ধ্যা আজ এত মলিন—জীবনে কিছু যেন আর তার নাই। এই তো এত নারীর সান্নিধ্য সে পাইয়াছে, অস্বীকার করিতে পারিতেছে না সেই একদিনের কলুষ-কামনার উন্মাদনা—সাঁকরেল থেকে ফিরিয়া যেদিন চম্পার রূপবহ্নিতে নিজেকে আহুতি দিবার জন্য ছুটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ নূতন এক জিনিস—এত কামনাময় হইয়াও এত নিষ্কলুষ!

কিন্তু তবুও সত্যই কি সর্বনাশ!…এখন তো বুঝিতেছে—আর তো অস্বীকার করিতে পারে না যে, শত নিষ্কলুষ হইলেও তটিনীর সংস্রবই তাহাকে তাহার ব্রত থেকে স্খলিত করিতে বসিয়াছে। নিজের কাছে বিশ্বাস না করা শক্ত যে, এত বড় একটা গুরুগম্ভীর ব্যাপার লইয়া সে নিঃশব্দে, আর নিশ্চয়ই তীব্র ঘৃণাভরেই তাহার সঙ্গ পরিহার করিয়া উঠিয়া গেল।

টুলুকে যখন আহারের জন্য ডাকিতে আসিল হীরা, তখন সে একভাবেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। চম্পা এ লইয়া একটি কথা বলিল না, খুব সম্ভব হীরাকেও আজ টুকিয়া দিয়াছিল, সেও বাচালতা করিল না, হাত পা গুটাইয়া, অতিরিক্ত ভদ্রভাব অবলম্বন করিয়া রহিল, এক রকম নিঃশব্দেই আহারটা সমাধা হইল।

সকালে টুলুর দৃষ্টি এড়াইয়া কয়েকবার আড়চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখটা বিশীর্ণ হইয়া গেছে, দৃষ্টিতে একটা জ্বালা। সমস্ত রাত সে ঘুমায় নাই— এটা জানে চম্পা, কেন না তাহার নিজেরও ঘুম হয় নাই, কয়েকবারই শুনিল টুলু দোর খুলিয়া বাহিরে আসিল, বুঝিল দাওয়ায় পায়চারি করিতেছে।

সমস্ত দিন এ সব লইয়া কিছু উচ্চবাচ্য করিল না। দারুণ অন্যমনস্কতার জন্য আজ সব কাজেই বিলম্ব হইয়া যাইতেছে বলিয়া টুলুর আশ্রম থেকে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। মুখ হাত পা ধুইয়া জলযোগ করিতেছে। চম্পা বলিল—"কাল আমার ফুরসৎ ছিল না, নৌকো ক'রে বেড়াতে যাও তো চল না আজ।"

হীরাও ছিল, বাঁ হাতটা জড়াইয়া বলিল—"হ্যাঁ বাবা, চল।"

টুলু চম্পার পানে চাহিয়া অল্প একটু বিরক্তির সহিত বলিল—"মোটেই ভাল লাগছে না চম্পা, কেন ওকে নাচালে?"

চম্পা হীরাকে বলিল—"যাবেন না হীরা, তুমি খেলোগে।"

কাল থেকে মায়ের দৃষ্টিতে কি একটা রহস্য আছে, হীরা মুখটা একটু চুন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

চম্পা দরজায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"যাবে না জেনেই বলা। কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে?"

টুলু একটু বিস্মিতভাবে বলিল—"কি ভাবে ?"

"এই যে কাল থেকে যে ভাবে চলছে—দিদি গিয়ে পর্যন্ত। তুমি সমস্ত রাত ঘুমোও নি, আর সব কথা না হয় বাদই দিলাম।"

টুলু নির্বাকভাবে চম্পার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ব্যাপারটাকে হালকা করিয়া ফেলিবার জন্য একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"গঞ্জডিহিতে সমস্ত রাত জেগে পাহারা দিতে, এখনও অভ্যেসটা যায় নি দেখছি।"

চম্পা ও-কথার উত্তর দিল না, বলিল—"আমি যা বলি শোন, দিদিকে আনিয়ে নাও, আমিই দিচ্ছি লিখে…"

"সে কি ? সর্বনাশ !"

এমন আতঙ্কিতভাবে আপনিই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল কথাটা দুইটা যে, এত গাম্ভীর্যের মধ্যেও চম্পা একটু না হাসিয়া পারিল না, বলিল—"দেখো ! দিদি বাঘ, না, ভাল্লুক ?"

টুলুর গাম্ভীর্য কিন্তু এতটুকুও নষ্ট হইল না, একটু মাথা নিচু করিয়া ভাবিল, তাহার পর বলিল—"চম্পা, গঞ্জডিহিতে—কি উপলক্ষ্যটা ঠিক মনে পড়ছে না আমার—আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তোমার আর আমার মাঝে গোপন কিছু থাকবে না, অন্তত আমি কিছু লুকুব না তোমার কাছ থেকে—যে ভাবে তুমি নিজেকে আমার কর্মজীবনের সঙ্গে জুড়ে ফেলেছ…"

আবেশে চম্পার চোখ দুইটি নরম হইয়া আসিল। টুলু একটু বিরতি দিয়া বলিল—"তাই তোমার কাছে আর অস্বীকার করব না যে, তটিনী সত্যিই আমার জীবনে মস্তবড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে…এটা হঠাৎ টের পেলাম আমি…"

চম্পা প্রশ্ন করিল—"বাধা কেন ? বাধা কিসের ?"

"সবটা শুনে যাও। মাস্টারমশাই তোমায় আমার শিষ্যা ব'লে গেছেন, আমি তোমায় তারও ওপরে জায়গা দিয়েছি আমার জীবনে—শিষ্যা বলতে, বন্ধু বলতে এক তুমিই আছ, তোমার পরামর্শ আমার দরকার। সবটা শুনে, আমার জীবনের যা কাজ তার সঙ্গে মিলিয়ে বল, বাধা নয়তো কি তটিনী ? ওকে প্রথম যেদিন দেখি

—হয়তো যে অবস্থায় আচমকা দেখা সেইজন্যই—ও সেইদিন থেকেই আমার মনের খানিকটা জুড়ে বসেছে। আট বছরের জেল-জীবনের ব্যবধানে হয়তো সেটা তলায় প'ড়ে গিয়েছিল, কিন্তু ছিল। মনে পড়ে—তুমি একদিন কি কথার মাথায় বলেছিলে, হীরার নতুন মা এনে দেবে?—সেই থেকে তটিনী আবার নতুন ক'রে জেগে ওঠে আমার মনে, তারপর এল আশ্রমে, তারপর চালের ব্যাপার নিয়ে আমি রইলাম ওর ওখানে। এখন মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছি ব'লে মনে পড়ছে চম্পা—ফিরে আসবার সময় তটিনীর চিন্তাটাকে মন থেকে ঠেলে রাখার জন্যে সমস্ত রাত পথে আমার অমানুষিক চেষ্টা করতে হয়েছে, অথচ আমি পারি নি।···তারপর এখানে এই মাসখানেকের ওপর একসঙ্গে থাকা···আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যতদিন তটিনী ছিল, বুঝি নি এতটা, ও চ'লে যেতে সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—আমি সত্যি ভয় পেয়েছি···"

চম্পা যেন নিজের মৃত্যুর রায় শুনিতেছে, অনুভূতিগুলা সব শিথিল হইয়া আসিতেছে, তবু নির্বিকারভাবেই বলিল—"সবটাই তো স্বাভাবিক। দিদির মতন মেয়ে একটা···"

"কিন্তু আমার জীবন তো স্বাভাবিক নয়।"

"খানিকটা স্বাভাবিক নয় ব'লে সবটাই অস্বাভাবিক ক'রে তুলতে হবে তার মানে কি? শোন আমার কথাটা, দিদিকে আনিয়ে নাও, তার মানে যা হয়—দিদিকে বিয়ে কর।"

টুলুর ঠোঁটে একটু শ্লেষের হাসি ফুটিল, বলিল—"এই জন্যে তোমায় বললাম সব কথা?—এরই নাম পরামর্শ দেওয়া?"

"হ্যাঁ, এরই নাম পরামর্শ দেওয়া; কেন না তুমি যেটা ঠিক ব'লে মনে করেছ, আমাকেও যদি তাই ঠিক ব'লে ধ'রে নিতে হয় তো তা হ'লে আর পরামর্শের কি রইল? কথাটা ভুল বলছি?"

"না, কথাটা ভুল বল নি, তবে পরামর্শটায় যে ভুল আছে সেটা তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথম, তটিনীর রাজি হওয়া চাই তো?"

"দিদির মন আগেই জেনে নিয়েছি আমি।"

"তাই নাকি ?" টুলু ক্ষণমাত্রের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া গেল, তাহার পর বলিল—"বেশ। তোমার কথা ? তুমি কি করবে ?"

"সব কথা দিদিকে খুলে বলব। তিনি বুঝবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে।"

"সিঁথির সিঁদুর তোমার ?"

"মুছে ফেললেই হবে ; ওর তো দাম নেই।"

"আমার কথা ?"

"কি তোমার কথা ?"

"তোমার সিঁথিতে মিছে সিঁদুর দিয়ে এতদিন আমার কাছে রেখেছি—সবার চোখে ধূলো দিয়ে।...এই আশ্রমে আজ আমি কী আছি, তোমার কপালের ঐটুকু সিঁদুর লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কী হয়ে যাব ভেবে দেখো। কেন সিঁদুর দেওয়া সেইটুকুই মনে ক'রে দেখো না। গণ্ডিডিহি ভুলে গেলে ?"

চম্পা চুপ করিয়া স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল টুলুর মুখের পানে। টুলু প্রশ্ন করিল—"তারপর হীরার কথা ? কত ক'রে গড়েছি ওকে ভেবে দেখ—তুমি, আমি, নরোত্তম ; দীক্ষা দিয়ে গেছেন মাস্টারমশাইয়ের মতন লোক। তোমার সিঁদুরের প্রবঞ্চনা ধরা পড়লে ও যে কয়লার খনির চেয়েও নিচে তলিয়ে যাবে।"

চম্পার চক্ষু দুইটা বিস্ফারিত হইয়া আসিল ধীরে ধীরে—সেই পরিণামটা যেন চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছে। তাহার পর হঠাৎ যেন বুদ্ধির উদয় হইল একটু, বলিল—"আমি ওকে নিয়ে চ'লে যাব। একদিন তো বলেছিলে।"

"তা হতে পারে ; এমন কি যাবার কারণটা চেষ্টা-চরিত্র ক'রে আপাতত লুকিয়েও রাখতে পার ওর কাছ থেকে। কিন্তু বয়েস আটকে রাখতে পার না তো ? একদিন বড় হয়েও টের পাবে ও এমন বাপের সন্তান যে এক স্ত্রীর লোভে এক স্ত্রীকে বাড়িছাড়া করেছিল। শুধু হয়তো মনে থাকবে—সেই বাপ খুব বড় বড় কথা বলত, অনেক উঁচু কথার ছড়া শিখিয়েছিল।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"আরও কিছু বলবার আছে নাকি ?"

নিরুত্তর দেখিয়া বলিল—"এই গেল ছেলের দিকের কথা, ওর ওপর সে অবিচারটা হতে পারে। আমার ওপর যা অবিচার তা ক'রেই ফেলেছ চম্পা।"

চম্পা মুখ তুলিয়া বলিল—"কি? অবিচার কি?"

"তটিনীকে পাবার জন্যে আমি তোমায় ইচ্ছে ক'রে হারাব?"

উত্তর দিবে কি, চম্পার যেন দাঁড়াইয়া থাকা অসহ্য হইয়া উঠিল, কোন রকমে বলিল—"ভুল হয়েছে সত্যিই; আমায় মাফ ক'রো; আমি যাই।"

"দাঁড়াও, আসল কথা তো তোমায় বলা হয় নি, এ শুধু তোমার পরামর্শের ভুলটুকু দেখা গেল…"

দাঁড়াইতে পারিতেছিল না বলিয়াই চম্পা ভুলটুকু স্বীকার করিয়াছিল, মুখটা একটু ঘুরাইয়া, নিজের অধরটাকে কামড়াইয়া অশ্রুটা দমন করিয়া লইল, তাহার পর আবার ঘুরিয়া সহজকণ্ঠে বলিল—"ভুল হয়েছে, তাই ব'লে সমস্তটাই যে ভুল এ কথা মানব না, একটা বড় কাজের জন্যে—আশ্রমের জন্যে—আমার মতন একটা মেয়েছেলেকে ত্যাগ করা চলে—উচিত; বলি চাই…"

আবার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

অভিমান হইয়াছে, না হইলে হঠাৎ 'বলি'র কথা বাহির হইত না চম্পার মুখ দিয়া। কেন অভিমান টুলু তাহাও জানে, কিন্তু উপায় কি? বলিল—"তাও দিতাম চম্পা, যদি না তাতে আশ্রমটাই বলি পড়ত। তোমার দরকার আরও বেশি হয়ে পড়েছে আশ্রমে।"

"কেন?—ঝঞ্ঝাট তো ক'মে এসেছে, এটুকু শীগ্‌গিরই যাবে; এখন যা কাজ তার জন্যে দিদির মতন মেয়েরই তো দরকার বরং।"

"এটা তো বাইরের ঝঞ্ঝাট ছিল। এ থেকে নিশ্চিন্দি হবার পরই তো আসল ঝঞ্ঝাট আরম্ভ হবে, যার জন্যে আশ্রম। তুমি ভুলে গেলে আশ্রমের উদ্দেশ্য?"

চম্পা আবার স্থির দৃষ্টিতে টুলুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ; তাহার পর ভীতভাবে বলিল—"আবার সেই সব?—সেই মাস্টারমশাইয়ের চিঠি?"

টুলু কতকটা নিষ্ঠুরভাবে বলিল—"হ্যাঁ চম্পা। আবার সেই সব আরম্ভ করতে

হবে ব'লেই তো তটিনী আমার সমস্যা, সেই জন্যেই তো তোমার পরামর্শ চাওয়া। শুধু তাঁতবোনার আশ্রম হ'লে আসতই বা তটিনী, তুমি সে ভাবে বিধান দিলে।...ক্ষতি কি ছিল এমন ?"

আজ রাত্রেও টুলুর চোখে ঘুম নাই। তবে নিঃশব্দেই পড়িয়া রহিল, জানে, চম্পাও জাগিয়া আছে।...আজ একটিমাত্র চিন্তা, চম্পাকে হারাইল টুলু। তটিনী যাওয়া অবধি ওর নব নব আবিষ্কারের যেন মরশুম পড়িয়া গেছে, কাল ছিল নিজের ভালবাসা সম্বন্ধে, আজ সেই ভালবাসা দিয়াই চম্পার অন্তরকে চিনিল। জানিত চম্পার মনের কথা আগেও, তবে ভালবাসা যে কী শক্তি, নারী হইয়া চম্পা যে সে-শক্তির কাছে আরও কত অসহায়, সেটা নিজের ভালবাসার নিরিখে আজ এই প্রথম বুঝিল টুলু। সেইজন্য এও বুঝিল যে, চম্পাকে হারাইতে হইল ; সাথী হিসাবে চম্পার গতি ফুরাইয়া গেছে।

একেবারে শেষ রাত্রে নিঃশব্দে উঠিয়া খুব সন্তর্পণে দুয়ার খুলিয়া বাহিরে গেল। আপিসের দুয়ারে ধীরে ধীরে কয়েকটা টোকা দিল। সবচেয়ে সজাগ ঘুম নরোত্তমেরই, দরজা খুলিয়া বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল—"আপনি ?"

"হ্যাঁ, চল নদীর ধারে।"

বাকি রাত্রিটা দুইজনে মিলিয়া পরামর্শ হইল—কি ভাবে কাজ করিতে হইবে, কে কে থাকিবে, এই সব। ওদিককার প্ল্যানটাও সবিস্তারে তখন শোনা হয় নাই, প্রশ্ন করিয়া করিয়া শুনিল।

উঠিবার সময় বলিল—"চম্পা এসবের কিছু ঘুণাক্ষরেও জানবে না নরোত্তম।"

নরোত্তম যে বিস্মিত হইল সেটা নিশ্চয় আহ্লাদের বিস্ময়,—মেয়েছেলে, যত দূরে থাকে ততই মঙ্গল ; তবু সহজভাবেই প্রশ্ন করিল—"কেন ? মা-মণি তো সবই জানেন।"

টুলু শুধু বলিল—"থাক্, পারবে না।...যতটুকু জেনেছে তার তো চারা নেই !"

২০

কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। দিন দাঁড়াইয়া থাকিবার নয় বলিয়াই কাটিয়া গেল, কিন্তু চম্পার মনে হয়, যেন আর কাটিতে চায় না।

টুলুর গতিবিধি অনেকখানিই বদলাইয়া গেছে। আশ্রমে থাকে কম; একবার তিন দিন বাহিরে কাটাইয়া আসিল, একবার পাঁচ দিন; চেহারাটা যেন ঝোড়ো কাকের মত হইয়া গেছে, দৃষ্টির সেই জ্বালাটা গেছে বাড়িয়া, ভ্রূকুটির মধ্যেই যেন কোন রকম প্রশ্নে আপত্তির ইঙ্গিত রহিয়াছে; চম্পা আর করেই না কিছু জিজ্ঞাসা, এত কৌতূহলের মধ্যেও করিল না।···নিশ্চয় রাত্রেও প্রায় বাহির হইয়া যায়। তটিনী থাকিতে কানন আর টুলু বাসার মধ্যেই একটা ঘরে শয়ন করিত, যে রাত্রে চম্পার সহিত কথা হইল, তাহার পর-রাত্রি হইতেই বাহিরে আপিস-ঘরে শুইতেছে; দুই দিন দেখিল, টুলু ভোরবেলায় গ্রামের দিক থেকে আসিতেছে।

চম্পা জিজ্ঞাসা না করিলেও কিন্তু প্রশ্নটা একদিন টুলুর কানে পৌছিয়া গেলই, ···হীরাও আজকাল বড় একটা আমল পায় না, একদিন আদর করিয়া ডাকিয়া একটু গল্প-স্বল্প করিতেছে, হীরা হঠাৎ বলিল—"বাবা, একটা কথা বলব, মাকে বলবে না?"

টুলু তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"যদি দরকার মনে করি তো বলব না? তুই-ই বল্ না রে হীরা, বড় হয়েছিস তো?"

হীরা একটু ভাবিয়া বলিল—"বেশ ব'লো, কিন্তু মাকে বকতে বারণ ক'রে দিও আমায়, রাজি তো?"

"হ্যাঁ, সে বরং কথা দিচ্ছি তোকে, বকবে না; বল্।"

"তুমি কোথায় যাও মাকে আর বল না তো।"

কথাটা ছেলের মুখ দিয়া ঘুরিয়া আসিবার জন্যই আজও বেশি করিয়া বাজিল

টুলুর বুকে, একটু চুপ করিয়া হাত বুলাইতেই লাগিল হীরার মাথাতে, তাহার পর বলিল—"তোর মাও তো যায় হীরা ; সেবারে সেই দুটো রাত কাটিয়ে এল মাঝের পাড়ার কার ছেলের অসুখে, আমায় বলেছিল ?…মনে নেই ?—তুইও কান্নাকাটি করলি।"

হীরা মুখ টিপিয়া হাসিয়া উপর নিচে মাথা নাড়িল। বাবা-মায়ের আড়াআড়িটুকু বেশ রুচিকর হইয়াছে। বলিল—"তুমিও যেমন আমায় বল না, আমারও তেমনি তোমায় বলতে ব'য়ে গেছে, কি বল বাবা ?"

"হ্যাঁ, এই তো তুই সব বুঝতে শিখেছিস হীরা। যা খেল্‌গে যা ; কই, আজকাল সে রকম কংগ্রেস-পতাকা নিয়ে খেলিস না তো ?"

"আমি দাঁড় ঠেলতে শিখছি বাবা, কলম্বাস-কলম্বাস খেলি আজকাল—অ্যামেরিকা আবিষ্কার করতে যাই। কাননকাকা গপ্প করত না সেই ? জাহাজ চালাবার গানও আছে. শোন না—

"খর বায়ু বয় বেগে,
চারিদিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
তুমি ক'ষে ধরো হাল,
আমি তুলে বাঁধি পাল—
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইও ॥
শৃঙ্খলে বার বার
ঝন্‌ঝন্‌ ঝংকার,
নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার…"

টুলু মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকে, অনেক দিনই দেখে নাই হীরার এই ছন্দ-রূপ, কিন্তু বড় অন্যমনস্ক হইয়া গেছে একটা কথায়, মাঝখানেই থামাইয়া বলিল—"থাক্, আর একদিন শুনব হীরা—ভাল ক'রে।…খেল্‌গে যা এখন, তোর মাকে একবার ডেকে দিয়ে।"

দুই পা গিয়া হীরার মনে পড়িয়া গেল, আবার ঘুরিয়া বলিল—"আবার বিদ্রোহও হয় বাবা, সত্যিকার।"

টুলু হাসিয়া বলিল—"সেটা ডাঙায় সেরে জাহাজে উঠো; নদীতে নতুন জল নেমেছে।...যাও ডেকে দাওগে।"

চম্পা আসিলে প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাই, কি করি, তোমায় বলি না ব'লে হীরার কাছে দুঃখ করেছ চম্পা?"

একটু বিস্মিত হইয়াই চম্পা বলিল—"বারণ করলাম তবু বলতে গেল তোমায়?...ওই আমায় জিগ্যেস করলে—কোথায় যাও তুমি, সে-পাঁচদিন কোথায় গিয়েছিলে? বললাম—আমায় আর বলেন না।"

সুযোগটা আপনিই আসিয়াছে দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"মিছেও তো বলি নি, কই, আর বল?"

"কি করবে সব কথা শুনে চম্পা?"

"তা হ'লে আর একটু বলি, তুমিই সেদিন বললে—কবে গঞ্জডিহিতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলে কিছু লুকুবে না আমার কাছ থেকে।"

"সে কিন্তু আমার সমস্ত কর্ম্মজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলে ব'লে, এখন তো ওদিক থেকে তুমি আলাদা হয়েছ।"

"আমি কি নিজে হতে আলাদা হয়েছি?"

"না, তবে যদি মনে কর আমিই ক'রে দিয়েছি, সেটা আরও ভুল, ওটা হয়ে পড়ল অবস্থা গতিকে। তুমি বুদ্ধিমতী, যদি কখনও স্থিরভাবে ভেবে দেখ, নিজেই বুঝতে পারবে। দেখই ভেবে, তাতে অন্তত আমার ওপর থেকে রাগ বা অভিমানটা কেটে যাবে। এই সঙ্গে একটা কথা তোমায় বিশ্বাস করতে বলি চম্পা, আমি এসব বলি না ব'লে স্বপ্নেও ভেবো না যে, তোমার ওপর আমার কোন রাগ বা অভিমান আছে। বলি না—অযথা তোমার দুশ্চিন্তা বাড়াতে চাই না ব'লে।"

টুলুর কণ্ঠস্বরটা স্নেহে করুণায় ছলছল করিতেছে।

সত্যই রাগ-অভিমান তো নাই-ই চম্পার উপর, বরং আরও গভীর স্নেহ আর মায়ায় মনটা সর্বদা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ও যে আর হাতে হাত রাখিয়া আগাইয়া আসিতে পারিল না, দাঁড়াইবার উপায় নাই বলিয়া ওকে যে পথের ধারে ফেলিয়া আসিতে হইল, এইটিই হইয়া রহিল মর্মন্তুদ। আরও একদিন এই রকম কথাচ্ছলে টুলু জিনিসটা আরও স্পষ্ট করিয়া দিল, বলিল—"মনে খেদ রেখো না চম্পা, এই রকমই হবার ছিল। আমরা দুজনে এলাম অনেকদূর একসঙ্গে, কিন্তু উদ্দেশ্য আমাদের এক ছিল না। তোমার যা উদ্দেশ্য, অবস্থা অনুকূল হয়ে তার অনেকখানি তোমায় দিয়েছে; সেইটুকুর মোহই যে কী ভীষণ তোমায় ভেবে দেখতে বলি। তুমি আরও যদি এগুতে যাও তো আমার জীবন করবে বিফল, চাও কি তাই?"

এই করিয়া বুঝাইতে হয় না চম্পাকে আজকাল, ওর পথ যে শেষ হইয়া আসিয়াছে, ভাল করিয়াই বোঝে সেটা।...আজকাল একা পড়িয়া গেছে, ভাবে বড় বেশি। এক এক সময় আরশির সামনে গিয়া প্রতিছায়াটির পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মনে হয় খুবই অন্তরঙ্গ দুই সঙ্গীতে মুখামুখি হইয়া আছে, দুই বুকে একই বেদনা লইয়া, এর চোখ ঝাপসা হইয়া আসিলে ওর চোখেও জল টলটল করে।...হ্যাঁ, পাইয়াছে বইকি—সিঁথির ঐ সিঁদুর, অবস্থাগতিকে অগ্নিসাক্ষী রাখিয়া পাওয়া সিঁদুরের মতই অনপনেয়; সন্তান স্ত্রীর মর্যাদা—সবাই পাইয়াছে—কত মিষ্টই যে লাগে নিষ্পাপ প্রবঞ্চনার অন্তরাল থেকে আশ্রমের সবাই যখন 'মা-মণি' বলিয়া ডাকে, তটিনী আসিয়া বলে—'বউ', কানন ডাকে 'বউদিদি'। অবস্থা আরও অন্তরঙ্গ করিয়া আনিয়া দিয়াছে টুলুকে, কথাবার্তার মধ্যে একটা ব্যবধান থাকিয়া গিয়াছিল, তটিনী আসায় 'আপনি' থেকে স্বামী-স্ত্রীর যে অন্তরঙ্গ 'তুমি'তে আসিয়া গেছে এটাও অবস্থার একটা কম আনুকূল্য নয়। বাইরের সবটুকুই পাওয়া গেছে—পূর্ণমূর্তিতে, কিন্তু প্রাণ কই?

চম্পার মনটা ব্যাকুল আবেগে উথলাইয়া উথলাইয়া ওঠে; কাহাকেও পায়

না বলিয়া অবস্থাকেই যেন দেবতা করিয়া লইয়া মনে মনে বলে—"আমি চাই না আর কিছু, আমার এইটুকুই বজায় রেখে দাও; এর সবটুকুই মিথ্যে, তবু এই মিথ্যে বুকে ক'রেই আমি নির্বিবাদে, আর কিছুই না পেয়ে কাটিয়ে দোব আমার জীবন। আমি চাই না এতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা—আমার প্রাণ যে ঢেলে দিতে পারছি এই আমার যথেষ্ট।"

কিন্তু কই আর থাকিতেছে এটুকুও? চম্পা চোখের সামনে দেখিতেছে ঐ অবস্থা—দেবতা কিরূপ হইয়া উঠিতেছে, টুলু যে ওকে তাহার জীবন থেকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া আগাইয়া গেল এর বেদনাই অসহ্য, আগাইয়া চম্পার কোন সর্বনাশের পথে যে চলিয়াছে ভাবিতেও আতঙ্কে ভরিয়া ওঠে সারা মন।

তবু, যত দিন যাইতেছে নিজের অদৃষ্টের সঙ্গে আপোস করিয়া লইতেছে চম্পা। এক এক সময় মনটাকে দৃঢ় করিয়াও লয়, মনে মনে নিজের অতীত জীবন থেকে ঘুরিয়া আসে—আরও কিছু অবলম্বন করিয়া কি এই জীবনে পা দেয় নাই? কেন, হীরা আছে তো, কোথা থেকে আসিয়া পড়িয়াছে তাহারই কোলে, তাহাকে মানুষ করিতে হইবে।···ছেলে লইয়াই পড়ে চম্পা—তাহাকে শেখায় পড়ায়, কানন কতকগুলা বই রাখিয়া গিয়াছিল, নিজে পড়িয়া গল্প বলে—বিবেকানন্দের বাণী, রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ; ওর গৌর আননে দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়া যে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয় তাহার কথা ভাবিয়া বর্তমানকে ভোলে চম্পা। ওর সেই খেলাধুলাকে আবার জমাইয়া তুলিতেছে—নকলগড়, সীতা-উদ্ধার, তোরণদুর্গ অবরোধ। চম্পা যেন নিজের সঙ্গে জেদাজেদি করিয়াই করে এসব; নিজের কুণ্ঠা-দুর্বলতা থেকে সরিয়া আসিয়া যেন মুক্ত ভূমিতে দাঁড়ায়—কই, চম্পা তো ভীরু নয়, এই তো সে নিজের সন্তানকে বীরধর্মে গড়িয়া তুলিতেছে; যাহার দীক্ষাগুরু—মাস্টারমশাই, বুকের রক্তে যিনি শিষ্যকে নির্দেশ দিয়া যান, পিতা যাহার আদর্শের জন্য অমন করিয়া আত্মবলি দেয়, তাহাকে চম্পা মেরুদণ্ডহীন একটা কীটের মত বুকের ভরে মাটি বহিয়া চলিতে দিবে নাকি?

কি রকম জোয়ার আসে মনে, চম্পা আরও বড় করিয়া অনুভব করে

নিজেকে। পারিবে, পারিবে—আদর্শের জন্য টুলু যত বড় বিপদকেই বরণ করুক না কেন, যাহাই কেন পরিণাম হোক না তাহার, চম্পা হাসিমুখেই সহ্য করিবে। টুলুকে নিবারণ করিবার জন্য পাশের জায়গাটি বাছিয়া লয় নাই, তাহাকে তাহার সিদ্ধির পথে আগাইয়া দিবে—চম্পার সিদ্ধিও যে তাহাই। টুলু না দিতে চায় স্থান সে জোর করিয়া নিজের স্থান অধিকার করিবে।

নদীর সহজ গতি নিবদ্ধ করিয়া জোয়ারের জল কিন্তু টেঁকে না বেশিক্ষণ, আবার নামিয়া যায়।

২১

দিনগুলা বড় এলোমেলো ভাবে কাটিতেছে। পৌষ মাস পড়িয়া গেল, বেশ শীত পড়িয়াছে। শীতে একে এমনি মন অন্তর্মুখী হইয়া পড়ে, তাহার উপর আজ দশদিন যাবৎ টুলু বাড়ি নাই। নির্জলা দুশ্চিন্তার দিনটা কিন্তু আজ ভালই কাটিল কিছুক্ষণ; দুপুরবেলা হঠাৎ কানন আসিয়া উপস্থিত, একটা কাজে দিন চারেকের জন্য দিদির কাছে আসিয়াছিল। একটা দিন এখানেও কাটাইয়া যাইবে।

আসিয়াই প্রথম প্রশ্ন চম্পার চেহারা লইয়া, বলিল—"চেনা যায় না যে বউদি —কটা দিনই বা আমরা গেছি বলুন না?"

চম্পা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল কথাটা, বলিল—"থাক্, এই কটা দিনেই ভুলে গেছ, সে কথা আর তুলতে হবে না বাহাদুরি দেখিয়ে; ওদিককার খবর বল আগে।"

পরকে আপন করিয়াই জীবন। দেবরকে পাইয়া যেন বর্তাইয়া গেল। একটু কাছছাড়া হইতে দিল না, ওরই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থার মধ্যে ঘর থেকে, দাওয়া থেকে, উঠান থেকে মুখ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া অনর্গল গল্প করিল,—মুখে কখনও হাসি, কখনও গাম্ভীর্য, কখনও বিস্ময়, রান্নার সময় রান্নাঘরের মধ্যেই মোড়ায়

বসাইয়া রাখিল হীরার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া, দুপুরে আশ্রমের কাজে কামাই করিল—যাহা ও কখনও করে না। গল্পের মাঝে মাঝে অবান্তর ভাবেই ক্রমাগত অনুযোগ করিল—"এলেই যদি, বউদিকে মনে ক'রে তো মাত্র একটা দিনের জন্যে —তারও আদ্দেকটা তো পথেই কেটে গেল। এ আসা তোমার মঞ্জুর হ'ল না ভাই, তা ব'লে রাখলাম,—এবার বউদির কাছে একদিন কাটাবে। তবে শোধবোধ হবে।"

বিকাল গড়াইয়া গেলে আর ধরিয়া রাখা গেল না; নৌকাযোগে কাশবনীতে দেশ আবিষ্কার করিতে যাইবার জন্য হীরক একেবারে ধরিয়া পড়িল। কানন বলিল--"একবার হয়ে আসি বউদি, আমার নিজেরও টান রয়েছে, বেশ লাগে জায়গাটা, সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব।"

নিজেই দাঁড় ঠেলিয়া লইয়া গেল, বনের ধারে নৌকাটা রাখিয়া তীরে উঠিল।

জায়গাটা যথার্থই একটু বন্যপ্রকৃতির। এইখানেই লম্বাচওড়া বেশ অনেকখানি জমির ওপর নদীটা কয়েকবারই স্রোত পরিবর্তন করিয়া সমস্ত তল্লাট-টাকে ভাঙিয়া চুরিয়া বসতি বা চাষবাসের একেবারে অনুপযোগী করিয়া দিয়াছে। উঁচু-নিচু জমির উপর কাশ, বনঝাউ, আরও কতকগুলা বেলে জমির আগছা, তারই মাঝে আবার এই সবে ঘেরা ফাঁকা জমিও আছে এখানে সেখানে। কাছেপিঠে গ্রাম না থাকায় বন্যরূপটা যেন আরও ভাল করিয়া ফুটিয়াছে।

কাননের মনটাই একটু অরণ্য-বিলাসী, তাহার ওপর সঙ্গীর অদম্য উৎসাহ, কতকগুলা চেনা জায়গা আছে, সেগুলা খুঁজিতে খুঁজিতে অনেকটা ভিতরে চলিয়া গেল, যে সময় নদীর ধারে ফিরিয়া আসিল তাহার অনেক আগেই সূর্যাস্ত হইয়া গেছে।

ভাঙা পাড় দিয়া নামিতে যাইবে, হঠাৎ একটা দৃশ্যে থমকিয়া দাঁড়াইল। শ চারেক হাত দূরে নদীর ওপারে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন লোক জমা হইয়াছে। ধারে একটা নৌকা আছে, দশ-বারো জন করিয়া নদীর মাঝামাঝি চড়াটায় নামিল,

নৌকাটা ফিরিয়া গেল, আরোহীরা চড়ার এপাশের নদীর ফালিটুকু পায়ে হাঁটিয়াই পার হইয়া ধীরে ধীরে কাশবনীর ও-প্রান্তে প্রবেশ করিল। আরও বাকি সবাই নৌকায় উঠিয়া মাঝের চড়ায় আসিল, এবং তাহারা এদিককার জলটুকু পার হইতে না হইতে নদীর ধারে আরও একটা দল আসিয়া উপস্থিত হইল। টুলু বিস্মিত হইয়া একটা কাশের আড়ের পাশে সরিয়া আসিয়াছে, হীরাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া। হীরা প্রথমে ব্যাপারটার মধ্যে যে অস্বাভাবিক কিছু আছে এমন বুঝিতে পারে নাই। কাননের ভাবগতিক দেখিয়া একটু বোধ হয় রোমান্সের গন্ধ পাইয়া প্রশ্ন করিল—"কারা কাননকাকা?"

কানন বলিল—"চুপ ক'রে দেখো এখন, পরে বলব।"

খানিকক্ষণ চুপ থাকিয়া হীরা ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দেশ অধিকার করতে এসেছে?"

অবশ্য অনেকখানি দূরে, তবু কানন তাহার মুখে হাত চাপিয়া বলিল—"হ্যাঁ, চুপ কর।"

আরও লোক আসিল ওপারে, সেইভাবেই নদী পার হইয়া নিঃশব্দে বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক এইভাবে চলিয়াছে, কাননের আন্দাজ মত প্রায় শ দুয়েক লোক বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, হীরা হঠাৎ জোরে ফিসফিস করিয়া বলিয়া উঠিল—"ও কাননকাকা, কলম্বাস!"

সত্যই দলপতি কলম্বাস। এইটেই শেষ দল, তাহাদের পুরোভাগে কানন দেখিল নরোত্তম। গা-ঢাকা অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, তবু ভুল হয় না, সেই দীর্ঘ ঋজু শরীর, ছায়াকারে হইলেও বলদৃপ্ত ভঙ্গী; মাথায় বড় বড় চুল; হীরা চেনে নাই, মাথায় কলম্বাসের রোমান্স গাদা রহিয়াছে বলিয়া।

কি ভাবিয়া টুলু তাহাকে কাশ-ঝাড়ের আড়ালে টানিয়া লইল, আর দেখিতে দিল না।

অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল। তীব্র কৌতূহল লইয়া টুলু অনিশ্চিতভাবে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, একবার মনে হইল আগাইয়া গিয়া দেখে ব্যাপারখানা

কি, কিন্তু হীরা সঙ্গে রহিয়াছে। বনে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না। মানুষের কণ্ঠের আওয়াজও যদি শুনিতে পায়—এই আশায় আর একটু অপেক্ষা করিল। কোনরকম আওয়াজ নাই। ওরা নিশ্চয় বনের ও-প্রান্তে গিয়া উঠিয়াছে; টুলু নামিয়া আসিয়া নৌকায় বসিল।

বাড়িতে আসিতেই চম্পা বেশ একটু অনুযোগ করিল—শহুরে লোক, একেই পাড়াগাঁয়ের কিছু জানে না, তাহার উপর এত রাত পর্যন্ত নদীতে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ানো···

হীরার পেট ফুলিতেছিল, প্রথম সুযোগেই বলিল—"দেশ আবিষ্কার দেখছিলুম মাক—লম্বাস নিজে এসেছিলেন।"

চম্পা বলিল—"মনের মতন কাকা পেয়েছ, দেখো; কোন্‌দিন এসে আবিষ্কার করবে—মা ম'রে প'ড়ে আছে।"

কানন একটা ছুতা করিয়া হীরাকে বাহিরে সরাইয়া দিয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা বলিয়া গেল।

সব শুনিয়া চম্পা বেশ সহজভাবেই বলিল—"অবশ্যি ঠিক বুঝতে পারছি না, নরু ফিরে না আসা পর্যন্ত···"

তাহার পর ব্যাপারটাকে আরও হালকা করিয়া দিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"তবে ও যখন রয়েছে বলছ, তখন তোমার ভাইপোর দেশ আবিষ্কারও নয়, কিংবা তুমি বোধ হয় যা ভয় করছ, কোথাও ডাকাতও পড়বে না; দেখছই তো আশ্রমের এরা অহিংসায় এক-একটি পরমহংস।···আসুক নরু, জিগ্যেস করছি।"

তাহার পর যেন হঠাৎ মনে পড়িয়া গেছে এইভাবে বলিল—"যদি না ফেরে আজ তো বুঝব লোকজন নিয়ে ধান কাটতে গেছে, আশ্রমের একটা বড় জমি আছে কিনা ওদিকে—মাইল পাঁচেক দূরে।"

কথাটা একেবারে বানানো। একটু পরে কানন আর হীরাকে ঘরে রাখিয়া একটা ছুতা করিয়া আপিস-ঘরে চলিয়া গেল। লাটু কুইতি নামের একজন লোক এই সময় পাহারায় থাকে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"নরু কোথায় জান?"

লাটু জানাইল—না, তাহার জানা নাই।

চম্পা বলিল—"এলেই আমার নাম ক'রে বলবে, সে যেন তক্ষুণি চ'লে যায়, আর আমার বাসাতেও না যায়, বলবে—মা-মণি নিজে এসে ব'লে গেছে। আমি নিজেই ডাকলে তবে যেন দেখা করে আমার সঙ্গে।"

কানন ভোরেই চলিয়া গেল। আসিয়াই যা প্রথম কথা ছিল যাওয়ার সময় তাহাই শেষ কথা—"আপনার চেহারা কিন্তু বড্ডই খারাপ হয়ে গেছে বউদি···টুলু-দাদা দশ দিন হ'ল বাইরে গেছেন বললেন না?"

চম্পা এবারেও হাসিয়া বলিল—"ভয় নেই, বিরহ আমার অত বেশি ক'রে লাগে না।"

তাহার পর সহজভাবেই বলিল—"বড্ড খাটুনি পড়েছে ভাই; দেখছই তো।"

কানন লজ্জিতভাবে বলিল—"আমিও সেই কথাই বলছিলাম—একার ওপর ঝোঁক পড়েছে।···দাদা এলে আপনি না হয় দিদির কাছেই চ'লে আসুন না কেন?···না হয় দিদিকেই পাঠিয়ে দোব দিন কতকের জন্যে?"

চম্পা যেন হঠাৎ একটু ভীত হইয়াই বলিয়া উঠিল—"না ভাই···এখন নয়।"

তখনই আবার সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"বলছিলাম—রোগা হওয়ার ভাগীদার করতে যাব কেন তাঁকে?···তবে আসতে হবে ব'লে রেখো—আমি চিঠি লিখলেই।"

সমস্ত পথটা মনমরা হইয়া কাটিল কাননের—আশ্রমের যেন ছন্নছাড়া ভাব—টুলু দশ দিন অনুপস্থিত···কাশবনীর ও ব্যাপারটা আদতে কি?···চম্পা নিজের মুখে একবারও তটিনীর যাওয়ার কথা তোলে নাই, কানন তুলিলেও ওটা যেন হঠাৎ ভয়ের ভাব ছিল না কি?···বেশ যেন যুৎসই বোধ হইতেছে না···

সমস্ত দিনটা ছটফট করিয়া কাটিল চম্পার। কানন চলিয়া যাওয়ার দিনটা এমনি বড় ফাঁকা ঠেকিতেছে, তাহার ওপর কাননের কাছে না হয় গোপন করিল, কিন্তু কাশবনীর ও ব্যাপারটা কি?···আরও একটু ব্যাপার হইল, বিকালে

নরোত্তম আশ্রমে আসিলে চম্পা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া কাশবনীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে নরোত্তম একটু ভাবিয়া বলিল—"থাক্ সে কথা মা-মণি। মানা আছে বলতে।"

তাহার পর নিজেই প্রশ্ন করিল—"জানলে কোত্থেকে ও-কথা ?"

চম্পা জানাইলে বোধ হয় একটা কড়া মন্তব্যই করিতে যাইতেছিল—কাননের ওখানে যাওয়া অন্যায় হইয়াছে, কিংবা বাইরের লোক আজকাল আসাই বন্ধ রাখিতে হইবে ; চোখ তুলিয়া দেখিল, চম্পার ঠোঁটের একটা কোণ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে এবং চোখের কোণ একটু সিক্ত—রাগে কিংবা অভিমানেই ; আর কিছু না বলিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে চলিয়া গেল।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় টুলু আসিল। এবার চম্পার প্রথম প্রশ্ন হইল—"এ কি চেহারা তোমার ! কোন অসুখে প'ড়ে গিয়েছিলে নাকি ?"

একমুখ দাড়িগোঁফ, চক্ষু দুইটা কোটরগত, গালের হাড়গুলা ঠেলিয়া উঠিয়াছে ; তেলের সঙ্গে যেন কতদিন সাক্ষাৎ নাই। টুলু কিন্তু চম্পার কথার উত্তর না দিয়া বলিল—"পাছে তোমাকেই ঐ কথা জিগ্যেস করি এই জন্যে আগে-ভাগে তুমিই জিগ্যেস ক'রে রাখলে চম্পা ? এত রোগা হতে তোমায় তো দেখি নি কখনও—আর এই কটা দিনে !"

এবারেও ঠোঁটের কোণ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল চম্পার—দুর্বলতার জন্য একটা স্নায়ুদোষ দাঁড়াইয়া গেছে ; চোখ দুইটাও অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল, কিছু বলিতে না পারিয়া মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

টুলু একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল—"কাঁদছ তুমি ? সে কি ?"

তখনও কাঁদে নাই ; কিন্তু আর সামলাইতে পারিল না নিজেকে চম্পা। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দুলিয়া দুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। টুলুর সামনে এই দ্বিতীয়বার।

টুলু কাঁধে ডান হাত তুলিয়া দিয়া স্নেহদ্রব কণ্ঠে বলিল—"চম্পা, আজ আমার কত বড় দিন ! কত বড় খবর নিয়ে তাড়াতাড়ি তোমায় বলতে এলাম !

এমন কি শুভদিন ব'লে আজ ভাল ক'রে খেতে হবে তোমার হাতে। আর তুমি ?…"

চম্পা সামলাইয়া লইয়াছে, চোখ দুইটা আঁচলে মুছিয়া ধরা গলায় প্রশ্ন করল—"কি খবর ?"

"আজ দক্ষিণে জাতীয় সরকার স্থাপন করা হ'ল।"

চম্পার অশ্রুসিক্ত মুখে বিশেষ ভাবান্তর দেখা গেল না, টুলু তবুও আবেগভরে ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া চলিল—"অবশ্য আমার ওর মধ্যে বিশেষ হাত নেই। আমি এই এক মাস ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, বুঝছিলাম, ট্রেনিং নিচ্ছিলাম, তাইতেই যা একটু করা হয়েছে ; কিন্তু নাইবা পুরোপুরি আমার হাতের কাজ হ'ল,—যা আসল, কাজটাই যে মস্তবড়…কী যে উৎসাহ চম্পা ! সমস্ত তল্লাটটায় প্রত্যেকটি লোক স্বাধীন হলাম ব'লে কী ক'রে বুক ফুলে দাঁড়িয়েছে দেখলেও আনন্দ। সবচেয়ে বড় কথা, ওরা পারবেই - ওদের মধ্যে গিয়ে ওদের ইতিহাস শুনলে, ওদের বুকের পাটা দেখলে এতটুকু সন্দেহ থাকে না ওরা পারবেই—ওদের দাবাতে তখনই পারবে গভর্মেণ্ট যদি আশী বছরের বুড়োবুড়ি থেকে কোলের শিশুটিকে পর্যন্ত নিঃশেষ ক'রে দেয়।…এরা নিশ্চয় পারবে—কিছু একটা দেখেছিলেন এখনকার হাওয়ায়, যার জন্যে মাস্টারমশাই এটা তাঁর চরম কর্মক্ষেত্র ক'রে নিয়েছিলেন।… আমার কি একটা কথা প্রায় মনে হয় জান চম্পা ?—এই জায়গায়ই খানা ডোবায় ভরা বাংলা দেশকে বিদ্যাসাগর দিয়েছিল ; সব লোকগুলোর মধ্যে কেমন যে একটা বিদ্যাসাগরী গোঁ আছে !"

কতকটা সেইরকম নির্বিকারভাবেই চাহিয়া চম্পা দাঁড়াইয়া রহিল। নিজের আবেগ সঞ্চারিত করিতে পারিতেছে না বলিয়া টুলু একটু অসহিষ্ণুভাবে বলিল… "কই, কিছু বলছ না কেন চম্পা ? এত বড় একটা খবর…মাস্টারমশাই এর জন্যেই প্রাণ দিয়ে গেলেন—আগস্ট আন্দোলনের পরের ধাপ এই—দেশের একটা অংশ পা তুলে দিলে সাহস করে, আর সবাই এবার এগুবে…"

চম্পা প্রশ্ন করিল—"আমাদের আশ্রমও এসে গেল এর মধ্যে ?"

"না, তবে আর দিন কতকের মধ্যেই যাবে এসে, সেই চেষ্টাই হচ্ছে—সারা জেলাটা নিয়ে—ভেতরে ভেতরে···এসব জায়গা তো এত তোয়ের ছিল না···এইবার হচ্ছে তোয়ের। শুধু স্বাধীন হলাম বললেই তো হয় না চম্পা, তার পেছনে শক্তি চাই, আর সেটা শুধু দাঁড়িয়ে মরবার শক্তি নয়। এই লড়াইয়ের সময়,—চারিদিক দিয়েই গবর্মেণ্টকে উদ্ব্যস্ত ক'রে তোলবার ক্ষমতা বাগিয়ে নিয়ে তবে ওদিকে করতে পেরেছে—জাতীয় সরকারের ঘোষণা।"

একটু বিরতি দিয়াই বলিল—"কিন্তু কই, তুমি আমায় একটু থিতুতে-জিরুতে বললে না তো আগে চম্পা—একটানা চ'লে আসছি···"

"হেঁটে?"

"না, সেই শিখ-লোকটির লরিতে।"

এর পর খাওয়া-দাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর কোন কথাই হইল না এ লইয়া, টুলু তুলিতে গেলেও চম্পাই—"এখন থাক্, এখন থাক্"—বলিয়া প্রতিবারেই বাধা দিয়া গেল। খাওয়া শেষ হইলে সে-ই আবার তুলিল প্রসঙ্গটা, বলিল—"কাল সন্ধ্যের পর কাশবনীতে নরোত্তম প্রায় শ দুয়েক লোক জমা করেছিল—আমায় বললে কানন, কাল দুপুরে এসেছিল, সন্ধ্যায় হীরাকে নিয়ে সেখানে বেড়াতে যায়।"

টুলু একটু যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেল, সেটা বোধ হয় কাননের উল্লেখে, তাহার পর বলিল—"রোজই হয় আজকাল, লোকগুলোকে শেখাচ্ছে পড়াচ্ছে, কয়েকটা ব্যাচ আছে, পালা ক'রে এক-একটাকে নিয়ে যায়। এর পর আরও কিছু ব্যাপার হবে ওখানে।"

কাননের কথা একেবারেই তুলিল না।

চম্পা স্থিরভাবে চাহিয়া শুনিয়া যাইতেছিল, বলিল—"একটা কথা জিগ্যেস করছি, সেদিন আমায় এসব কথা শুনতে বারণ করেছিল, আজ যেন নিজে থেকেই বলছ।"

"লুকুবার দরকার নেই; চলবেও না লুকুলে।"

"কেন ?"

"বিপদটা যে কত বড়—জানা দরকার তোমার। তুমি একটা কথা জেন, দক্ষিণে এই জাতীয় সরকার নিয়ে গবর্মেণ্ট বেশি ঘাঁটাঘাটি করবে না, কিন্তু আর যাতে একটুও না ছড়াতে পারে তার জন্যে কোনরকম অত্যাচারই বাকি রাখবে না। ওদের পলিসি হবে—একটুখানি জায়গায় আবদ্ধ হয়ে জিনিসটা যাতে আপনিই চুঁইয়ে ম'রে যায়।...তা হ'লেই বুঝছ বিপদটা কত, আর সে বিপদের মধ্যে তোমাদের থাকা চলবে না।"

চম্পা হঠাৎ মুখটা কঠিন করিয়া বলিয়া উঠিল—"কোথায় যাব আমি! বাঃ!"

টুলু ওর ভঙ্গী দেখিয়া বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল; চম্পা বলিল—"তোমরা গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে যে উপায় করেছ, তোমাদের বিরুদ্ধেও আমি তাই করব; জ্যান্ত আমায় সরাতে পারবে না এখান থেকে।"

টুলু একটু সেই ভাবে চাহিয়া থাকিয়াই বলিল—"বেশ, হীরাকে পাঠিয়ে দাও তটিনীর কাছে।"

চম্পা বলিল—"হীরাও যাবে না; মরতে হয় এইখানে মরবে। জন্মাবার আগেই বাপ খেয়েছে, যাঁকে পেলে কপালজোরে, বিপদের মুখে তাঁর পাশ থেকে স'রে যাওয়ার চেয়ে মরাই ভাল ওর।"

২২

কথাটা বলিল বটে চম্পা, কিন্তু হীরাকে সরাইয়া দিবার জন্য ওই বেশি ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তাহার কারণ আশ্রমটি দিন দিনই ওর কাছে আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিতে লাগিল।

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে এখন প্রায়ই বন্দুকের আওয়াজ হয়; বেশি জোর নয়,—ফট্-ফট্ ফট্ করিয়া আওয়াজ, দূরে ছাত-পেটার মত, কাশবনীর দিক থেকে আসে আট মিনিট দশ মিনিট অন্তর। কখনও একটু বেশি বিরতি, কিন্তু থাকে

অনেকক্ষণ পর্যন্ত। চম্পা 'বড় মুখ করিয়া হীরার কথা বলিয়াছিল বলিয়া অনুরোধটা গলায় যেন আটকাইয়া যাইতে লাগিল, তাহার পর একদিন সঙ্কোচের হাত এড়াইয়া বলিয়া ফেলিল—"ওকে পাঠিয়ে দাও এখান থেকে।"

টুলু বলিল—"হ্যাঁ, তাই ভাবছি; তুমিও যাও চ'লে, বুঝতেই তো পাচ্ছ সব।"

চম্পা আজকাল একটু খিটখিটে হইয়া পড়িয়াছে, একটু রাগের সহিতই বলিল—"দায়-পড়া ভেবে দর কষছ! হীরার সম্বন্ধে হারলাম ব'লে, নিজের সম্বন্ধেও হার মানব ভেবেছ বোধ হয়? পরের ছেলে ঘাড়ে তুলে তুমিই নিয়েছিলে, ভাল করবার ছুতোয় যদি প্রাণটা যায় ঐ বাপ-মা-মরা অনাথের···"

একেবারে নূতন ধরনের ভঙ্গীতে টুলু হকচকিয়া গিয়াছিল, বাধা দিয়া হাসিয়া বলিল—"তুমি যে রীতিমত রাগ করলে দেখছি চম্পা; তা নয়, আর চাই না তটিনীকে এ সবের মধ্যে টানতে।···বেশ ভেবে দেখি কি করা যায়।"

চাপা রহিল কথাটা। ইতিমধ্যে চম্পার দেহে-মনে আরও ভাল করিয়া ঘুণ ধরিতে লাগিল।

আশ্রমের ব্যাপার আরও ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। নূতন নূতন লোকের আমদানি বাড়িয়াছে, তবে থাকে না বড় একটা কেহ; কেমন যেন একটা চাপা নিঃশব্দ চঞ্চল ভাব। চম্পা কিছু জিজ্ঞাসা করে না, তবে টুলুই বলে মাঝে মাঝে, আশ্রমের নিজের পাঁচটা গ্রাম থেকে এখন বারোখানা গ্রামের মধ্যে কাজ হইতেছে, ক্রমেই বাড়িতেছে—প্রায় তৈয়ার সব।···ওদিকে দক্ষিণের জাতীয়-সরকার প্রবলবেগে কাজ করিয়া যাইতেছে, ও এলাকার গভর্মেণ্ট একরকম নিষ্ক্রিয়—আইন, আদালত, রাজস্ব, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বার্তাবহন—সব বিভাগেই আশ্রমের সঙ্গে ওদিককার প্রতিনিয়তই সংবাদ আদান-প্রদান চলিতেছে, সবচেয়ে নূতন—বিদ্যুৎ-বাহিনী নাম দিয়া একটা সামরিক বিভাগও উঠিয়াছে গড়িয়া; ভিতরে ভিতরে আয়োজন ছিল, এখন কতকটা খোলাখুলিই আত্মপ্রসার করিতেছে।···সমস্ত জেলাটাতেই এই আদর্শে কাজ হইতেছে ভিতরে ভিতরে।

চম্পা চুপ করিয়া শোনে। এর আগে বিদ্রোহ সম্বন্ধে কথা হইলে, মনে মনে

যাই থাকুক বাহিরে বিরুদ্ধে মত দিত না, এখন আর ভিতরে বাহিরে অমিল রাখে না, পারৎপক্ষে চুপ করিয়াই থাকে, কখনও কখনও প্রশ্ন করে—পুলিস টের পাইলে কি হইবে; এক-এক বার বিরুদ্ধ মন্তব্যই করিয়া বসে। একদিন, শরীর আরও ভীষণভাবে খারাপ হইয়া যাইতেছে বলায় ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিয়া বলিল—"হোক না গে, স্বাধীন ভারতের মহারাণী হ'লেই ঠিক হয়ে যাবে আবার।"

কেমন যেন হইয়া যাইতেছে চম্পা—টুলু ভাবে; কিন্তু সময় পায় না স্থিরভাবে ভাবিবার।

তাহার পর হঠাৎ ব্যাপারটা গুরুতর আকার ধারণ করিল। একদিন সন্ধ্যায় টুলু আসিয়া খবর দিল—গোপন সংবাদ পাইয়াছে, আশ্রমে পরদিন সন্ধ্যায় পুলিস আসিয়া হানা দিবে।

চম্পার মুখটা ফ্যাকাশে হইয়া গেল, প্রশ্ন করিল—"কি ক'রে টের পেলে?"

"আমরাও ব'সে নেই চম্পা, পুলিসের ঘরে আমাদের গোয়েন্দা এখন, কোশ তিনেকের মধ্যে ওদের লোক এসে পড়লে আমাদের বিশ-পঁচিশ মিনিটও লাগে না সে খবর পেতে, নইলে দিনদুপুরে বন্দুকের নিশানা অভ্যেস করা চলে? আমাদের চর প্রত্যেকটি ঘাঁটি আগলে আছে সর্বক্ষণ।"

চম্পা আবার একটু ব্যঙ্গের স্বরেই কহিল—"আগলাবার তো এই নমুনা।"

"হয়তো তা নয়; জেলার যেখানে যেখানে আশ্রম বা কর্মকেন্দ্র আছে সেখানে সেখানেই খানাতল্লাসি করবে শুনছি ভালমন্দ বিচার না ক'রে; এও বোধ হয় তাই।...যাই হোক, এবার তো এই সবের জন্যে তোয়ের থাকতেই হবে।"

টুলুর আহারের সময় এই কথাটা আবার তুলিল চম্পা, বলিল—"আজ তোমায় একটা কথা জিগ্যেস করব; সব তো করছ, কিন্তু আমার ব্যবস্থা করছ?"

"এ ব্যাপারটার পরই তুমি চ'লে যাও চম্পা।"

চম্পা বিরক্তির সহিতই উত্তর দিল—"বাজে ব'কো কেন? যা হবার নয়

তাই। বলছিলাম—পুলিসে আজকাল নানা রকমই অত্যাচার করছে—মেয়েদের মান-ইজ্জৎ থাকছে না…"

টুলু অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া আহার করিল, তাহার পর বলিল—"আহ্লাদীর মাকে জান ?"

এ দুর্গতদের মধ্যে সেই বিধবা মেয়েটি, যে একদিন রাঁধিতে রাঁধিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিয়াছিল—'আমরাও চুপ ক'রে থাকব না, টলিয়ে ছেড়ে দেব', সে এখানেই থাকিয়া গেছে এবং কাজ করিতেছে। চম্পা বলিল—"জানি বইকি।"

"তাকে জিগ্যেস ক'রো এ কথা।"

চম্পা একটু থামিয়া বলিল—"আর একটা অনুরোধ—আজ রাত্তিরটার জন্যে শুধু—হীরাকে পাঠিয়ে দিলে না, আজ রাত্তিরে তুমি আমার ঘরেই শুয়ো…আরও দু-একজন লোক নিয়ে না হয়।"

"বুড়ি তো শোয়ই।"

"আমার কেমন ভয় করছে হীরাটার জন্যে। কি জানি, পুলিস যে কোনও সময় হয়তো এসে পড়বে।"

"ও না হয় আমার ঘরেই শোবে।"

"ওকে কাছ-ছাড়া করতে পারব না।…পুলিসের হাঙ্গামটা চুকে গেলেই ঠিক হয়ে যাবে আবার।"

টুলু আবার চুপ করিয়া আহার করিল একটু, তাহার পর বলিল—"বেশ, আর লোকের দরকার কি ?—একলাই শোব।"

অথচ এই চম্পাই এক সময় সারারাত জাগিয়ে টুলুকে দিত পাহারা। টুলু বিস্মিত হয়,—সে শক্তি যদি ভালবাসারই হয় তো আজ এ পরিণতি কেন ?

পুলিস আসিল দুপুরের একটু পরেই। জানে, ওদের ওপরও চর আছে—যতটা পারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সময় পাল্টাইয়া লয়। টুলু খবর পাওয়ার পর থেকেই প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল, খানাতল্লাসি করিয়া কিছুই পাওয়া গেল না। তবে চলিল অনেকক্ষণ, আশ্রম ভালরকম করিয়া ঘিরিয়া। চম্পা আশ্রমের দিকের

জানালাগুলা আধ-ভেজানো করিয়া হীরাকে কোলের কাছে চাপিয়া চুপ করিয়া দেখিতে লাগিল। আশ্রমের অন্য বাসাগুলাও তল্লাস হইল, যতই না পাইল কিছু ততই জিনিসপত্র ফেলিয়া ছড়াইয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল। টুলুর বাসাও বাদ গেল না।

সেই দারোগা ; শেষ হইলে টুলু একটু ক্ষুন্ন স্বরে বলিল—আমাদের আশ্রমটাও বাদ দেওয়া হ'ল না?"

দারোগা একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"আপনাদের এদিকে বন্দুকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে মশাই।"

"সে তো আমরাও শুনি। নদীর চরে ওধারে পাখি বসে আজকাল…"

"সে তো চিরকালই বসে ; বন্দুকের আওয়াজ ছিল না।"

"আজকাল মিলিটারি থেকে শুনছি স্মাগ্‌ল্ হচ্ছে। শোনা কথা, আপনারাই জানেন ভাল।"

প্রায় ঘণ্টা চারেক কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় পুলিস বিদায় হইল।

চম্পা এ ঘটনার চাপটা আর সহ্য করিতে পারিল না, অসুখে পড়িয়া শয্যা গ্রহণ করিল।

টুলু চিন্তিত হইয়া পড়িল, কিন্তু এমনই অবস্থা আজকাল যে জেলাবোর্ডের ডাক্তারকে ডাকিয়া আনাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেও তিনটা দিন লাগিয়া গেল। ডাক্তার আশঙ্কার কিছু বলিল না, তবে জানাইল যে, ভালরকম বিশ্রামের দরকার, স্নায়ুদৌর্বল্যের জন্য এ রকমটা হইয়াছে। সেবনের জন্য ঔষধের সঙ্গে একটা সালসার ব্যবস্থা করিয়া গেল। সেটা আসিতেও দুই দিন লাগিল, অর্থাৎ টুলু যখন টের পাইল চম্পা কাহাকেও দিয়া আনাইয়া লয় নাই।…দুঃখ করিয়া বলিল—"আমার ওপর এখনও ভরসা কর চম্পা? লক্ষীটি, এমনভাবে নিজেকে নষ্ট ক'রো না, সংসারী হিসেবে আর আমার পদার্থ নেই।"

শয্যা লইয়া অবধি চম্পা যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া গেছে, নিরুপায়ের

নিশ্চিন্ততা, তাহার যেন আর কিছুই করিবার নাই। তাহার ঘরের আশ্রমের দিকের জানালাটা একটু উঁচুতে ছিল, টুলুকে বলিয়া নামাইয়া লইয়াছে। বিছানায় শুইয়া বাহিরের পানে চাহিয়া থাকে। প্রশস্ত প্রাঙ্গণটা, সামনে আশ্রমের কয়েক-জন কর্মীর বাসা, বাঁ দিকে আশ্রমের টানা চালাটা। শীতের প্রায় সমস্ত দিনই ঘর ছাড়িয়া বেশির ভাগ লোকই বাহিরে আসিয়া কাজ করে—চরখা কাটা, কাঠের কাজ। স্কুলটা হয় রৌদ্রের মধ্যেই। শুদ্ধ চপলতার সঙ্গে একটা মিশ্র গুঞ্জন মিলিয়া চমৎকার একটি শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ডান দিকে নদীটায় নীল জলের রেখার পাশে সাদা বালির চর জাগিয়া উঠিয়া সূর্যকিরণে চিকচিক করিতেছে, ওপারে ঘাটের আর গ্রামের চঞ্চলতা দূরত্বের জন্য আরও মৃদু। চম্পা চাহিয়া চাহিয়া দেখে; আশ্চর্য লাগে—এই স্নিগ্ধ পরিবেশের অন্তরালে অমন সব সর্বনাশা কাণ্ড চলিতেছে—ঐ মৌন গ্রামগুলাও তা থেকে বাদ যায় না।

ঘরে ওর নিত্যসঙ্গী বাউরী বুড়িটি আর হীরক। রুটিনগত সেটুকু কাজ—স্কুলে যাওয়া, আশ্রমের পিছনে অন্য ছেলেদের সঙ্গে বাগান করা—সেটুকু সারিয়া হীরা যে মায়ের কাছে আসিয়া বসে আর নাওয়া-খাওয়ার সময় ভিন্ন বড় একটা ওঠে না। মায়ের কাছে গল্প শোনে, চম্পা ফরমাস করিলে বই পড়িয়া শোনায়। যদি কখনও নিতান্তই খেলার দিকে টান হয়, কিংবা চম্পাই জোর করিয়া দেয় পাঠাইয়া, একটুখানির মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া আরও আকুলভাবে মায়ের কাছে লুটাইয়া পড়ে, গলা জড়াইয়া আদর করে, হাতটা টানিয়া নিজের গলায় জড়াইয়া আদর কাড়ায়, শীঘ্র ভাল হইয়া উঠিবার জন্য আবদার ধরে। এক এক সময় চম্পা ওকে ঘাঁটায়—বেশ তো, যদি না-ই আর ভাল হয় চম্পা—মরিয়াই যায়, নূতন মা আসিবে হীরা, নূতন নূতন আদর খাইবে হীরা। নাকে কাঁদিয়া, হাত পা আছড়াইয়া সে অনর্থ লাগায়। চম্পা তাহা হইতেই জীবনের নূতন রস সঞ্চয় করে।

দিন দশেক ভুগিবার পর আবার উঠিয়া বসিল চম্পা। টুলু দুই দিন থেকে

নাই, কিন্তু এ সব গা-সওয়া হইয়া গেছে। পথ্য লইয়া আশ্রমের সীমানার মধ্যে হীরাকে লইয়া একটু ঘুরাফিরা করিয়া বেড়াইল, বেশ ভালই লাগিল। রাত্রে একটু বেশি শীত বোধ হওয়ায় ঘুমটা হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। দেখে, আশ্রমের দিকের জানালাটা খুলিয়া গেছে কখন; উঠিয়া বন্ধ করিতে যাইবে, বাহিরে নজর পড়ায় থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী কি ত্রয়োদশী হইবে, সবে মাত্র পূর্বাকাশে এক ফালি চাঁদ উঠিয়াছে, তাহার জ্যোৎস্নায় দেখিল আশ্রমের ছইওলা গাড়িটা আসিয়া আপিসের সামনে দাঁড়াইল, তাহার মধ্যে থেকে টুলু আর নরোত্তম নামিল, দুইজনের হাতেই দুইটা রাইফেল, আর নামিয়া নরোত্তম চট দিয়া জড়ানো যে একটা বাণ্ডিল আপিস-ঘরের দিকে লইয়া গেল তাহার মধ্যেও যে ঐ বস্তুই রহিয়াছে বাণ্ডিলের আকার দেখিয়া চম্পার আর তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

নরোত্তম রহিল, টুলু আবার সেই গাড়িতেই বাহির হইয়া গেল।

আসিল পরদিন বেলা আন্দাজ দশটার সময়।

দুপুরে চম্পা নিজের ঘরে শুইয়া আছে, হীরা গেছে স্কুলে, টুলু আসিয়া একটা মোড়া টানিয়া লইয়া চম্পার সামনে বসিল, হাতে একটা লম্বা খাম। বলিল—"একটা বিশেষ দরকারী কথা আছে চম্পা তোমার সঙ্গে, হীরার বিষয়ে।"

চম্পা বলিল—"পাঠিয়ে দেবে?—দাও তাই, আর দেরি ক'রো না।"

"কেন, নতুন কি হ'ল?"—বলিয়া টুলু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

চম্পা উত্তর করিল—"এর ওপরও আরও নতুনের দরকার?...তবে, তাও হয়েছে; কালকের রাত্তিরের ব্যাপারটা আমি দেখেছি,—দেখে ফেলেছি বলাই ঠিক।"

"ভালই হয়েছে। না, আমি সে কথা বলছি না।...আমি রাজসাহী গিয়েছিলাম চম্পা, একবার যে পাঁচদিন ছিলাম না, সেই সময়। সে একদিন সবিস্তারে বলব 'খন। বাবা মা দুজনেই গেছেন—অনেকদিন। বিষয়-সম্পত্তি

তাড়াতাড়ি যতটা সম্ভব ঠিকঠাক ক'রে এলাম ; আর এই আমার উইল—তোমার আর হীরার নামে…"

চম্পা হঠাৎ আতঙ্কে সিঁটকাইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল—"উইল !…উইল কেন ?"

"সব তো দেখছই ; যা আসন্ন তা থেকে চোখ সরিয়ে ফল আছে চম্পা ? ওরা আর কোন কেন্দ্রকেই মাথা তুলতে দেবে না, আমরাও দিতে হয় তোলা মাথাই দোব।"

চম্পা অস্থির হইয়া পড়িল, অবুঝের মতই বলিতে লাগিল—"না, উইল কি !—অলুক্ষুণে কথা !—রেখে দাও গে—ছিঁড়ে ফেলো গে, ও আমি ছুঁতে পারব না—বাঃ, উইল করবার কি হয়েছে ?—অলুক্ষণ !…না, তুমি যাও আমার কাছ থেকে এখন—আমার মাথার ঠিক নেই—নিয়ে যাও ওটা—ছেলের আমার অকল্যাণ ক'রো না—উইল পাবার বয়স হয় নি এখনও ওর…"

২৩

ধীরে ধীরে চম্পার মন কিন্তু কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। উইলের ব্যাপারই তো হইয়া আসিয়াছে, চোখ বুজিয়া কি এ সত্যকে ঠেলিয়া রাখা যাইবে ?

চম্পা সারাদিন ধরিয়া ভাবিল, এই সত্যের রূপটা যেন প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিল নিজের দৃষ্টির সামনে। রাত্রে টুলুর আহার না হওয়া পর্যন্ত অন্যমনস্ক রহিল খুব। তাহার পর নিজের ঘরে গিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া কাগজ কলম লইয়া একটা চিঠি লিখিতে বসিয়া গেল।

চিঠিটা তটিনীকে। চম্পা নিজের ইতি-কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছে ; এ-সব কাণ্ড হইতে দিবে না। তটিনী আসুক—এমন করিয়া লিখিল নিজের একেবারে মৃত্যুশয্যার কথা ইনাইয়া-বিনাইয়া যে, তটিনীর না আসিয়াই উপায় থাকিবে না—পাঁচ সাত দিন, যাই হোক। তাহার পর কি করিতে হইবে চম্পা জানে ;

তটিনীর মোহে জড়াইবে টুলুকে, দুজনেরই মন জানা, নিজের মন দিয়াও জানে কি সর্বনাশা রোগ এই ভালবাসা—দুজনেই দুজনকে এড়াইয়া চলিতেছে বলিয়া বাঁচিয়া আছে ; ও একত্র করিয়া দিবে, যাদু বিস্তার করিবে ; ওর সিদ্ধি একেবারে করায়ত্ত। এত দিন চেষ্টা করে নাই, নিজের স্বার্থ ছিল—কে আর ঘরের শত্রুকে আমন্ত্রণ করিয়া আনে ? আজও স্বার্থ, এই স্বার্থের কাছে সে-স্বার্থকে বলি দিবে চম্পা।

চিঠি লিখিতে লিখিতে মনটা উদাস হইয়া যাইতেছে, যেন নিজের মৃত্যুর রায় লেখা, হাত কাঁপে, চোখ সজল হইয়া আসে। আর কোন উপায় নাই কি বাঁচাইবার—সব দিক রক্ষা করিয়া ?···টুলুকে কি করিয়া ছাড়িবে চম্পা ?···

কোন উপায় নাই, মনকে কঠিন করিয়া চম্পা শেষ করিল চিঠিখানা, আর কোন কথাই নাই, একবার শেষ দেখা করিবার ইচ্ছা—আকুতিতে ভরা। তাহার পর মনে পড়িল নিজের সীমন্তের সিঁদুরের কথা। টুলুর সেদিনকার যুক্তি —সত্যই তো, এটুকু থাকিতে তটিনীকে ডাকিয়া ফল কি ? আর মোছা তো কোন মতেই যাইবে না এটুকু।···চম্পা যেন পাগলের মত হইয়া উঠিল—ওটা যেন সিঁদুর নয়, অগ্নিশিখা হইয়া সমস্ত মাথাটায় আগুন ধরাইয়া দিতেছে।···হে ভগবান, এর মধ্যে কি সত্যই কোথাও প্রবঞ্চনা ছিল ?—রক্ষাকবচ করিয়া সেটা মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল, আজ সেটা এমন অভিশাপে দাঁড়াইল কেন ?

রাত্রি গড়াইয়া চলিল।···আবার বোধ হয় ছইওলা গাড়িটা বাহির হইতে আশ্রমে প্রবেশ করিল। হীরা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে, ঘুমের মধ্যেই ডান হাতটা চঞ্চল হইয়া উঠিল—একটা অভ্যাস, মাকে খোঁজে ; চম্পা হাতটা নিজের হাতে তুলিয়া লইল।

চিন্তা আবার পূর্বের খাতে ফিরিয়া আসিল,—হ্যাঁ, আরও একটা উপায় আছে—সিঁদুর না মুছিয়াও,—টুলুকে ভাল করিয়া ফিরাইয়া, যখন ওর ওদিকে ফিরিয়া যাইবার আর উপায় থাকিবে না, যখন ও মৃত্যু থেকে সুনিশ্চিত জীবনের পথে, সেই সময় হীরাকে লইয়া চম্পা চুপি-চুপি সরিয়া পড়িবে।· এ কথাটাও

সেদিন হইয়া গেছে, হীরার জীবনে এ ঘটনার প্রভাব।···কিন্তু অত ভাবিয়া কাজ করা চলে না তো। সেটা ভবিষ্যৎ, ঢের উপায় আছে; এখন সব চেয়ে বড় বর্তমান—আর যে কোন উপায় নাই।

চম্পা মন স্থির করিয়া ফেলিল।

মনটি স্নিগ্ধতায় ভরিয়া গেছে—বাঁচাইবে টুলুকে চম্পা; নিজেকে বলি দিয়া এমন করিয়া বাঁচানোয় যেন একটা নূতন ধরনের আনন্দ আছে।···অনাগত দিনের একটি চিত্র ধীরে ধীরে চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল—একটি পরিচ্ছন্ন সংসারের চিত্র—টুলু, তটিনী, আরও সব···হীরাকেও ফিরাইয়া দিবে চম্পা, অনেক উপায় আছে—টুলুকে কোন দিক দিয়া বঞ্চিত হইতে দিবে নাকি?—কবে, কোন্ বিষয়ে দিয়াছে বঞ্চিত হইতে?

কিন্তু যদি না থাকিতে পারে চম্পা? এই তো গঞ্জডিহিতে ছাড়িয়া গিয়াছিল, গৃহে চলিয়া গিয়াছিল হীরাকে লইয়া, পারিল কি থাকিতে? আবার যে ছায়ার মত আট বৎসর পাশে পাশে ঘুরিতে হইল···যদি তেমন করিয়া আবার অভিশাপ হইয়া ফিরিতে হয়—সর্বনাশ হইয়া যাইবে যে!

এই চিন্তাটাই স্থায়ী হইয়া রহিল অনেকক্ষণ—একটা বিভীষিকার আকারে। তাহার পর চম্পার মনে পড়িল, মুখটা কঠিন হইয়া উঠিল, তখন আছে উপায় তাহারও—আছে বইকি।

মাথার বালিসের তলায় হাত দিয়া একটা ছোট লাল কাগজের ডিবা বাহির করিল চম্পা—পুলিসের জুলুমের প্রতিষোধ দিয়াছে আল্লাদীর মা—সেই বিধবাটি—একটা ছোরার সঙ্গে; উর্মিবিক্ষুব্ধ দুস্তর চিন্তাসাগরে একটা অবলম্বন পাইল চম্পা।···যদি কখনও আসে দুর্বলতা, আবার টুলুর জীবনে ফিরিয়া আসিবার লালসা জাগে তো এই তাহার মহৌষধ।

কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। হাতের

মুঠায় সেই কৌটাটা।...হঠাৎ এ কি ?...তন্দ্রাঘোরে চাহিয়া চম্পার পূর্বরাত্রের চিন্তাগুলা একে একে মনে পড়িল।

কিন্তু কেন বলা যায় না, এই গভীর স্তব্ধ রাত্রে চিন্তা আবার হঠাৎ এক নূতন রূপ লইয়া দেখা দিল,—এই মৃত্যুকল্প রজনীর মধ্যে জীবনটাকে যেন নূতন অর্থে অর্থবান মনে হইল; চারিদিকের স্তব্ধ সমাহিত ভাবে মনে হইল জীবন বড় পবিত্র, বড় বিরাট—ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র জন্ম-মৃত্যুর অতীত যেন একটা কিছু—অনন্ত কাল ধরিয়া অখণ্ড অমরত্বের পথ দিয়া তাহার যাত্রা।

কেন সে টুলুর জীবনকে এ ভাবে নষ্ট করিবে? কী অধিকার তাহার অমন একটা জীবনকে ক্ষুদ্র ভালবাসার গ্লানির মধ্যে নামাইয়া আনিতে?—কী অধিকার তাহার এই মহাতপস্বীর তপস্যাভঙ্গে? এই জন্যই কি তাহার পাশে অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এতে ওর সীমন্তের সিঁদুরের চেয়েও বড় অভিশাপ হইয়া রহিল সে নিজেই।

না, চম্পা অত দুর্বল নয়, মিথ্যাচারিণী নয়—কতবারই বলিয়াছে—"কখনও তোমার পথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াব না।"...এই শর্তেই তো ওর স্থান টুলুর পাশে, এই বিশ্বাসেই।

পূর্বরাত্রের সংকল্প মুছিয়া চম্পা নূতন সংকল্পের প্রতিষ্ঠা করিল। চিঠিটা এবারও টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া জানালাটা খুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল।

তাহার পর আবার আশঙ্কা,—ফের যদি কখনও এই দুর্বলতা আসে!—এই তটিনীকে দিয়া টুলুর ব্রতভঙ্গের অশুভ কল্পনা!...কত দুর্বল মানুষ—দেখিল তো এই ছাব্বিশ বছরের সামান্য জীবনেই ..

কি মনে হইল, চম্পা ধীরে ধীরে উঠিল, জানালাটা দিল খুলিয়া; কালকের সেই চাঁদ, আজ আরও ক্ষীণ, গাঢ় অন্ধকারের বুকে একটি যেন আলোর ইঙ্গিত।... ও দুর্বলতাও তো যায় মেটানো—যায় না? একেবারেই ওর উৎস-মুখ যদি নিরুদ্ধ করিয়া দেয় চম্পা...

রাঙা কৌটাটি খুলিয়া চম্পা নিজের কণ্ঠে উবুড় করিয়া ধরিল, তাহার পর

আবার বিছানায় আসিয়া, হীরার মাথায় হালকাভাবে হাতটা রাখিয়া ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল।

২৪

একটিমাত্র মানুষ নিঃশব্দে বিদায় লইয়া অন্তর্জগতে একটি নিঃশব্দ প্রলয় ঘটাইয়া গেল। এত যে কাজ—কাজ, কাজ এখন টুলুর কাছে যেন বিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, হীরার মুখের দিকে তাকাইতে পারে না, এমনই দু-একবার নজর পড়িয়া যাইতে দেখে ছল-ছল চোখে একদিকে চাহিয়া বসিয়া বা দাঁড়াইয়া আছে; নিজে অভিভূত হইয়া পড়িবার ভয়ে টুলু আর ডাকিয়া দুটা ভুলাইবার কথা বলিতে সাহস পায় নাই। সবচেয়ে অসহ্য হইয়াছে নিজের অন্তরের দিকে তাকানো, অথচ কাজ একমাত্র দাঁড়াইয়াছে নিজের অন্তরের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকা, নিজেকে প্রশ্ন করা আর নিজের কাছে উত্তর খোঁজা।···কেন গেল চম্পা? —ও কি নিতান্তই সামান্য রমণীর মত ক্ষুদ্র ঈর্ষার গণ্ডি অতিক্রম করিতে পারিল না? কিংবা একটু অসাধারণ হইয়া নিজের বঞ্চনার সিঁদুর লইয়া টুলুর সুখের পথ থেকে সরিয়া দাঁড়াইল তটিনীকে নীরব আহ্বান দিয়া? কিংবা সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে, সব সুখ-লালসার মধ্যে চম্পা স্থির নিষ্ঠায় নিজের অন্তরে অন্তরে মাস্টার-মশাইয়ের সেই মহামন্ত্রটি ধরিয়া রাখিয়াছিল—একটা নারী যদি শুধরাইয়া যায় একটা জাতি শুধরাইয়া যাইতে পারে।···তাই, যখন বুঝিল নিজের ভালবাসার করাল ক্ষুধা লইয়া ও টুলুর এই জাতি-সাধনার অন্তরাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে—শুধুই শুধরানো নয়, ও কি এইভাবে নিজেকে একেবারে অগ্নিশুদ্ধ করিয়া লইল?

এক-একটি মুহূর্ত যে-সময় অমূল্য সে-সময় কয়েকটা দিনই এইভাবে কাটিয়া গেল। নরোত্তম একলা সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না, একলাই আশ্রম আর বাহির করিতেছে। এদিকে চারিধারেই ধরপাকড়ের ধুম পড়িয়া গেছে, কয়েকটা

কেন্দ্রে অগ্নিসংযোগের খবর পাওয়া গেল; ওদিকে দক্ষিণের মূল কেন্দ্র থেকে তাগাদা আসিতেছে—এইবার সব কেন্দ্রকেই একজোটে একদিনে দাঁড়াইয়া উঠিতে হইবে, নয়তো একে একে ধ্বংস হওয়া ভিন্ন গতি নাই।

একবার তিন দিন বাহিরে কাটাইয়াও ফিরিয়া আসিয়া এই ভাব দেখিয়া বলিল—"আপনার মতন মানুষও যদি স্ত্রীর মৃত্যুতে এত অধীর হয়ে পড়েন···"

টুলু উদাসভাবে চাহিয়া বলিল—"স্ত্রীর মৃত্যু আর চম্পার মৃত্যু যে এক নয় নরোত্তম।"

কথাটা যেন আপনিই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, নরোত্তম কিছু না বুঝিয়াই বলিল—"সে বুঝি বইকি, মা-মণির মতন মেয়ে···সারা দেশটায় হায় হায় রব উঠে গেল।···তবে দাদু-ভাইয়েরও মুখ চাইতে হবে তো, এত উচাটন হ'লে চলবে?···আর ইদিকেও···"

নরোত্তম একবার কুণ্ঠিতভাবে মুখের পানে চাহিল, তারপর কুণ্ঠাটা যেন জোর করিয়া কাটাইয়া উঠিয়া বলিল—"আর, ইদিকেও আর যে সময় নেই বাবাঠাকুর। খবর নিয়ে এলুম, পরশু নাকি সব থানাতেই জাতীয়-সরকার কায়েম করা ঠিক হয়ে গেছে—এই সময় একটা ভয়ানক জুলুম হবে, পুলিস টের পেয়েছে তাদের ঘরেই এদিককার চর মোতায়েন আছে, কবে যে কোন্‌খানে গিয়ে উঠে পড়বে আর জানতে পারা যাচ্ছে না। দক্ষিণের সঙ্গে একজোটে না দাঁড়িয়ে উঠতে পারলে পিষে ফেলবে। বলবার অবসর নয় এটা বাবাঠাকুর, বুঝি সব, মা-মণি কি আমারও বুকখান খালি ক'রে দে যায় নি? কিন্তু অধৈর্য হ'লে সব যে যায়। পণ্ডিতমশাই হাতে ক'রে চারাটা পুতেছিলেন বুকের শোণিত দিয়ে, নিজে আপনি বাড়ালেন, শেষে শোকে অধৈর্য হয়ে···"

নরোত্তম মিনতির দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর একটা যে চরম সান্ত্বনা পাইয়া গেছে এই ভাবে বলিল—"আর তিনি তো কপালের সিঁদুর বজায় রেখে গেছেন বাবাঠাকুর, হিঁদুর মেয়ের আর এর চেয়ে বড় কাম্য কি?"

কথাটা এত অদ্ভুত লাগিল টুলুর যে, সে কেমন এক নূতনতর দৃষ্টিতে

নরোত্তমের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ বড় অন্যমনস্ক হইয়া গেছে—একদিনের বিস্মৃত একটি ছবি হঠাৎ চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল, যেদিন দেখিয়াছিল অত অবহিত হয় নাই।—সন্ধ্যার একটু আগে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখে, ঘরের জানালার সামনে বাঁ হাতে আরশিটা ধরিয়া চম্পা মাথা নিচু করিয়া ডান হাতের আঙুলের ডগায় সীমন্তে সিঁদুর টানিয়া দিতেছে, মুখের পাশটার একটু দেখা যায়—বোধ হয় একটু হাসি লাগিয়া আছে, আর কী গভীর অভিনিবেশ! চম্পা যেন পূজায় নিরত।

যেন চলচ্চিত্রের দ্রুত টানে কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে কত বেদনা, কত অব-হেলার ছবি জাগিয়া উঠিয়া টুলুর মনটা নূতন করিয়া উদ্বেল করিয়া দিল, খানিকক্ষণ কোন কথাই বলিতে পারিল না, তাহার পর গভীর মিনতির স্বরে বলিল—"নরোত্তম, তোমার কাছে দুটো দিন ভিক্ষে চাইছি, মাত্র দুটো দিন—পরশু এগারোটা দিন পুরো হচ্ছে, চম্পার কাজ; তটিনীর ওখানে গিয়ে আমি হীরাকে দিয়ে এইটুকু শেষ ক'রে আসি। ভেবেছিলাম, নিজে আর যাব না, কাউকে দিয়ে হীরাকে পাঠিয়ে দোব—এখন মনে হচ্ছে, নিজেই যাই একবার, এর শেষ কাজ…"

নরোত্তম, আর নরম হওয়া যেন চলে না এইভাবে একটু নিরাসক্ত কণ্ঠেই বলিল—"এইখানেও তো হতে পারে বাবাঠাকুর—ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি…এই জায়গায় ছিলেন তিনি—ভালবাসতেন, তাঁর বাপের ভিটে একরকম…"

টুলুর মুখটা বিরক্তিতে দৃঢ় হইয়া উঠিল, বলিল—"না নরোত্তম, এখানে হঠাৎ বাধা এসে পৌছুতে পারে, চম্পার এই শেষ কাজে আমি ছোটবড় কোনরকমই উপদ্রব সহ্য করতে পারব না।"

ভাঙা গৃহস্থালি হইতে দরকারী জিনিসগুলা গুছাইয়া লইতে যা একটু দেরি হইল, তাহার পরই টুলু হীরাকে লইয়া আশ্রমের গাড়িতে বাহির হইয়া পড়িল। নানারকম চিন্তায় মনটা তোলপাড় করিয়া দিতেছে। হীরা

আজকাল কমই কথা কয়, বাড়ির পাট উঠিয়াই গেছে, বাইরে টুলু-নরোত্তমকে পাওয়াও যায় না আর; তবু বোধ হয় যাত্রার শিশু-সুলভ উত্তেজনাতেই একটু আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল বাবার সঙ্গে, উত্তরের অসঙ্গতিতে এবং কোন কোন প্রশ্নের উত্তরের অভাবে শেষ পর্যন্ত উৎসাহ না পাইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। টুলুর বোধ হয় এক সময় হুঁশ হইল, ছেলের সঙ্গে এই শেষ যাত্রা, নিজে হইতেই আবার আরম্ভ করিল গল্প।···হীরা পড়াশুনা করিতে যাইতেছে, আশ্রমে তো তেমন স্কুল নেই—হীরার যুগ্যি—তাই ব্যবস্থা হইল হীরা ঐখানে থাকিয়াই পড়িবে—চমৎকার জায়গা ওটা, হীরার বড়-মা আছে, কানন কেমন আসিবে মাঝে মাঝে, রতন আসিবে···রতনকে হীরা দেখে নাই—বড় চমৎকার, একবার দেখিলে আর ছাড়িতে ইচ্ছা করিবে না হীরার···

হীরা প্রশ্ন করে—"আর, তুমি থাকবে না বাবা ?"

উত্তরটা যেন কঠিন হইয়া গিয়া টুলুর গলাটাকে রুদ্ধ করিয়া ধরে, বলে—"হ্যাঁ, আমি থাকব এসে মাঝে মাঝে তোর কাছে, থাকব বইকি। তারপর তোর পড়াশোনা শেষ হ'লে তুইও চ'লে আসবি। আর জানিস হীরা ? তোর বড়-মা, কাননকাকা, রতনকাকা সবাই আশ্রমেই আসবে চ'লে, তখন আবার বড় হয়ে তুই রতনকাকার মতন কলকাতায় যাবি চ'লে কলেজে পড়তে।··· বড়-মার কাছে এখন লক্ষ্মীটি হয়ে থেকে মন দিয়ে পড়াশোনা করবি···"

"আর, খেলা বাবা ?···নকল-গড়, তোরণ-দুর্গ—ইংরেজে-বাঙালীতে লড়াই—আমি বাবা পতাকা নিয়েছি সঙ্গে, তা মনে ক'রো না যে ভুলে গেছে হীরে !"

হীরা আবার মুখর হইয়া উঠিতেছে ধীরে ধীরে।

টুলু চুপ করিয়া যায়, মনটা আবার আলোড়িত হইয়া ওঠে, একটু পরে হীরার মাথায় হাতটা তুলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করিতে থাকে, টুলু আশীর্ময় হইয়া ওঠে, বলে—"সব সময় কি একই খেলা হীরা ? বড় হয়ে কি করতে হবে তাই জন্যেই তো খেলা শেখা, নয় কি ? তা ও-খেলা তো

তোর রইলই শেখা হীরা, দরকার হয় কুম্ভর মতন নিজের দেশের মান বাঁচাবি, শিবাজীর মতন শত্রুর হাত থেকে নিজের দুর্গ কেড়ে নিবি, দেশ থেকে অত্যাচারী বিদেশীকে তাড়াবি···কিন্তু আমি আশীর্বাদ করছি, ও-সবের দরকার হবে না হীরা, আমরা—তোর দাদুর সঙ্গে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁরা তোর জন্যে দেশের এসব জঞ্জাল মিটিয়ে যাব···তোদের হবে আরও বড় কাজ, তোরা দেশকে আরও নতুন ক'রে গড়বি—শুনেছিস তো রামায়ণ-মহাভারতের গল্পে কি রকম ছিল আমাদের দেশ ?—সেই রকম ক'রে—তার চেয়েও ভাল ক'রে। তারপর নিজের দেশকে গ'ড়ে নিয়ে···

হীরার উৎসাহ ফিরিয়া আসিতেছে, অনেকদিন পরে এত মন খুলিয়া কথা বাপের ; নিজের কথা কহিবার যেসব মুদ্রাদোষ সেগুলাও আসিতেছে ফিরিয়া, তাড়াতাড়ি বাবার মুখটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"চুপ কর বাবা, শোন না বলছি—সেদিন মাও এইসব কথা বলছিলেন—আমরা নতুন রাস্তা গড়ব, তারপর সেই রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে প'ড়ে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ব, এই দেশের লোক ব'লে কত পূজো করবে আমাদের সবাই···মাও বলেছিলেন বাবা··· কবে জান বাবা ?—সেই একদিন—যেদিন অনেক রাত ধ'রে আমার সঙ্গে গল্প করলেন না ?—আমায় তুলে বললেন—তুমি মাকে একলা ফেলে কোথায় চ'লে গেছ—আমায় পাহারা দিতে হবে···"

এর পরেই কথা যাইতে লাগিল বাধিয়া, পথের একঘেয়েমি ক্লান্তি মনকে আরও স্তিমিত করিয়া আনিতে লাগিল, আর এ-উৎসাহকে ফিরাইয়া আনা গেল না।

সন্ধ্যা নামিল, হীরা ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া অবশেষে বাপের হাঁটুতে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল, টুলু একেবারেই আত্মগত হইয়া রহিল বসিয়া।

শীতের অল্পায়ু সন্ধ্যা গিয়া রাত্রি নামিল। যেখানে টুলুর কাননের সঙ্গে দেখা হয় সেবার, সেই জায়গাটা ছাড়াইয়া গেছে একটু, এমন সময় পিছনে রাস্তার বাঁকে মোটরের দুইটা হেডলাইট দেখা গেল, বেশ জোরে চলিয়া আসিতেছে ; কাছে আসিয়া গাড়িটার গতি শ্লথ হইল, তাহার পর বলদ-

গাড়িটার পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। হেডলাইটে চোখে ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছিল, দাঁড়াইতে টুলু দেখিল সেই শিখের লরিটা।

নামিয়া আসিল নরোত্তম, বলদ-গাড়ির পিছনে দাঁড়াইয়া টুলুকে বলিল—"একবার নেমে আসতে হবে আপনাকে।"

দুইজনে গিয়া গাড়ি থেকে একটু তফাতে দাঁড়াইলে বলিল—"আজ রাত্তিরে যে কোন সময় পুলিসে হানা দেবে আশ্রমে, বোধ হয় জন পনরো থাকবে বা তারও বেশি, এবার আর খানাতল্লাসি নয়, আশ্রম পোড়াবে, নেবার মতন জিনিস সব সরিয়ে নিয়ে, রুখতে গেলেই গুলি চালাবে।"

টুলু গাড়ির মধ্যে একবার ঘুমন্ত হীরার দিকে চাহিয়া লইয়া বলিল—"ঠিক কখন্ তা টের পাওয়া গেল না?"

"না, যেমন খবর তাতে বেরিয়ে প'ড়ে থাকতে পারে। জিনিসপত্র আপিস থেকে সরিয়ে ফেলেছি, আশ্রমও একেবারে খালি ক'রে সবাইকে কাশবনীর এপারে আমবাগানে লুকিয়ে বসিয়ে রেখে এসেছি।"

"কেন, এ রকম করলে কি ভেবে?"

"দু রকম পরামর্শ হতে পারে বাবাঠাকুর; এক, যখন ওরা আশ্রম তল্লাস করবে আগুন দেবার আগে, সেই সময় হঠাৎ আক্রমণ ক'রে ওদের শেষ করা; আর, একেবারে গা-ঢাকা দেওয়া; ওরা ধরাক আগুন, না হয় ঘরগুলোই গেল।"

দুই দিককার টানে টুলুর মনটা যেন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, শেষের কথাটায় আর একবার ঘুমন্ত হীরার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"হঠাৎ গা-ঢাকা দেওয়া, তাও তোমার মুখে শুনছি নরোত্তম!"

"কারণ আছে বাবাঠাকুর, পরশু আমাদের এদিককার জাতীয়-সরকারের ঘোষণার দিন, সেইটে ক'রে তারপর ওদের সঙ্গে একহাত খেলা যাবে, তখন আমরা না থাকলেও কাজ চলবে।"

টুলুর মনটা যেন অনেকখানি শান্ত হইয়া আসিয়াছে। চুপ করিয়া ভাবিল খানিকক্ষণ, তাহার পর বলিল—"তোমার মতটা কি?"

"আজ ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গেলে ও-কাজটা বোধ হয় আর হবেও না বাবাঠাকুর—কতকগুলো কাজ ওদিকে বাকি আছে এখনও জানেনই। বলছিলাম—যাক না হয় খান কতক ঘর এখন।"

বুকের চাপা নিশ্বাসটা টুলু নিঃশব্দে মুক্ত করিয়া দিয়া বলিল—"বেশ, তাই করোগে তবে। আমি পরশু শেষরাত্রে কাশবনীর জোড়া বাবলার নিচে এসে পৌছুব, তুমি থেকো—একলাই।"

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আবার ছইয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। লরিটা স্টার্ট দিয়া আগাইয়া গেল, অপরিসর রাস্তা, যতক্ষণ না একটা তেমাথা গোছের পাইতেছে ঘুরাইতে পারিতেছে না।

২৫

আবার চিন্তার ঝড় উঠিল টুলুর বুকে, বুকটা এত জোরে ঢিপঢিপ করিতে লাগিল যেন শব্দটা পর্যন্ত শোনা যায়।...টুলু আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়াছে, সত্যই কি এই তাহার নিজের মত—গা-ঢাকা দেওয়া? অথচ এই একটা ছুতা পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল, কেন এরকম?

টুলু গিরিধারীকে প্রশ্ন করিল—"কতটা গিয়ে লরিটা ঘোরবার জায়গা পাবে গিরিধারী, জানা আছে?"

গিরিধারী একবার দুই ধারে দেখিয়া লইল ভাল করিয়া, তাহার পর বলিল—"আর পোটাক পরে রায়গঞ্জের রাস্তাটা বেরিয়ে গেছে ডাইনে, সেইখানে ঘুরতে পারবে।"

আরও বাড়িয়া গেল বুকের ধুকপুকুনিটা—যাইতে আসিতে এই এক মাইল রাস্তা, লরির পক্ষে মিনিট দু-তিন, ঘুরিতে আর একটু, অতটাই না হয়, এই মিনিট পাঁচেক; তাহার পরই লরিটা আবার সামনে দিয়া বাহির হইয়া যাইবে, আর কোন উপায়ই থাকিবে না।

টুলু যেন বুকে জোর পাইবার জন্যই বুকের কাছে জামাটা খামচাইয়া ধরিল ; বিদ্যুৎগতিতে মনটা এই প্রায় নয় বৎসরের সমস্ত জীবনের উপর দিয়া ঘুরিয়া আসিল—কত দুঃখ, কত বেদনা-ভরা জীবন—তাহার তপস্যা—এর জন্য সে সবই ছাড়িয়াছে—একটার পর একটা কাটাইয়া আসিয়াছে—ধর্মের বিলাস—সত্যই তো এই রুক্ষ কঠোর তপস্যার সামনে সেটা বিলাসই বইকি ; তারপর নারীর মোহ, তারপর নিছক দেহের মোহের চেয়েও যা শতগুণে কঠিন, নারীর ভালবাসা। আজ তবে এ আবার কি ?

টুলুর হৃদয় মথিত করিয়া চম্পার স্মৃতি জাগিয়া উঠিল ; আজ তাহার এ দুর্বলতা ঐ শোকেই, টুলু বুঝিল—একটির পর একটি করিয়া কে যেন তাহার সন্ন্যাসের পথে সব প্রতিবন্ধকগুলিই সাজাইয়া গিয়াছে ; এই শেষ, কাটাইয়া উঠা যায় না এটুকুকেও ?

লরিটার আওয়াজটা থামিয়া গেছে, নিশ্চয় রায়গঞ্জের রাস্তার মোড়ে আসিয়া গেল।

আর যে সময় নাই !

টুলু সোজা হইয়া বসিল, গিরিধারীকে বলিল—"দাঁড় করাও গাড়িটা।"

আর একটুও আগাইয়া লরির সঙ্গে ব্যবধানটা কমাইতে চায় না, চিন্তার যতটুকু সময় পাওয়া যায়।

এই শোকও জয় করিতে হইবে, এও একটা বিলাস, এসব টুলুর জন্য নয়। আর, যে গেলই চলিয়া তাহার জন্য এতটুকু শ্রদ্ধানিবেদন করিয়াই বা কি হইবে ?…একটা আত্মপ্রবঞ্চনাই নয় কি—ভদ্র আকারে ?

সঙ্গে সঙ্গে টুলুর আরও একটা কথা মনে হইল, হঠাৎই—কে জানে এই শ্রদ্ধা-নিবেদনের অন্তরালে তটিনীর আকর্ষণ আছে কিনা…হয়তো সেইটাই আসল—মনের মগ্নচেতনার সন্ধান কে রাখিতে পারে ? কর্মক্লান্তির মধ্যে শোকের অবসাদে টুলু বোধ হয় আবার তটিনীর কাছেই ধরা দিতে যাইতেছে—ভালবাসাকেও জয় করিয়াছে বলিয়া যে-দম্ভ, তাহার অন্তরালেও বোধ হয় পরাজয়েরই আয়োজন চলিয়াছে।

অন্ধকারের মধ্যে লরির হেডলাইট দুইটা দিকচক্রের উপর দিয়া আবার এই-দিকে ঘুরিল, লরিটা মুখ ফিরাইয়াছে।…টুলুর মনে হইতেছে, উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডটা এবার ফাটিয়া যাইবে।

টুলুর সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল।

ঘুরিয়া নামিতে যাইবে, ঘুমন্ত হীরার মুখের উপর দৃষ্টিটা পড়ায় আবার নিশ্চল হইয়া বসিল।…এই যে আরও প্রতিবন্ধক বাকি, এ যে সব চেয়ে শক্ত…হীরাকে কি করিয়া ছাড়া যায়?—কোথায় যায় ফেলা?…কয়বার করিয়া মা-বাপ হারাইবে এই অবোধ শিশু?…

কাঁকরের উপর লরির শব্দ জাগিয়া উঠিয়াছে—উগ্র হইয়া উঠিতেছে—কি যেন ছেদন করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। গিরিধারী গাড়িটা যতটা সম্ভব পাশে করিয়া লইল।

টুলু নামিয়া একেবারে রাস্তার মাঝখানে গিয়া দুই হাত তুলিয়া দাঁড়াইল,—পাছে একটু ভুল হইয়া যায়, এতটুকুও সন্দেহ থাকে ড্রাইভারের মনে ··

প্রায় শেষ মুহূর্ত বলিয়া লরিটা সশব্দে ব্রেক করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। নরোত্তম উপর থেকেই একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"এ কি!"

অন্যরকম সন্দেহ করিয়াছিল বোধ হয়, মনের যা অবস্থা!…টুলু ঠোঁটের কোণে একটু হাসিয়া বলিল—"না, আত্মহত্যে করতে যাচ্ছিলাম না। নেমে এস।"

নরোত্তম নামিয়া আসিয়া বলিল—"ভেবে দেখে মতটা বদলাতে হ'ল নরোত্তম, গা-ঢাকা দিলে চলবে না।"

নরোত্তম বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করিল—"তবে?"

"আশ্রমে যারা আগুন দিতে আসবে তাদের ফিরে যেতে দোব না; তার মানে নিশ্চয় এই যে, নিজেদেরই শেষ হতে হবে। তাই হয়তো তারই ব্যবস্থা করতে হবে।"

নরোত্তম যে ক্ষুব্ধ তা নয় মোটেই, তবে খুবই বিস্মিত, নির্বাকভাবে মুখের

পানে চাহিয়া রহিল। টুলু বলিল—"যেতে যেতে সবিস্তারে বলব পথে, প্ল্যানও ঠিক করতে হবে, তবে মোটামুটি খানিকটা বলি—ভেবে দেখলাম রক্ত দেওয়াই দরকার এখন, মানুষের মনের ফসলের জন্যে ওর মতন সার আর নেই। দক্ষিণে আগস্ট-সেপ্টেম্বরে রক্তস্রোত বয়েছিল ব'লেই আজ জাতীয় সরকার সম্ভব হয়েছে —সার দেওয়া জমিতে ফসল ফলেছে। আরও ফলবে।...আমরা যাই—যাবই—ক্ষতি নেই—মানুষ তোয়ের হবে। এ দেশে লোকেরই অভাব নরোত্তম, লীডারের নয়। এ যা সময়, গা-ঢাকা দেবার সময় নয়।"

নরোত্তম একটু নীরব থাকিয়া বলিল—"বেশ, তা হ'লে আপনি হীরা-দাদুকে রেখে আসুন, লরি ক'রেই, আমরা দাঁড়াই।"

টুলু মনে মনে যেন শিহরিয়া উঠিয়াই বলিল—"না, আর কি একপা এগুই ওদিকে!—মানে, আর কি সময় আছে নষ্ট করবার?...হীরাকেও আর ওঠানো চলবে না।...ইয়ে—তোমাদের কাছে কাগজ পেন্সিল আছে?...সিংজী, আপনার কাছে আছে?"

সিংজী ইঞ্চি দুয়েকের একটা পেন্সিল আর নোটবুক থেকে একখানা পাতা ছিঁড়িয়া দিল। নোটবুকের উপরই সেটা রাখিয়া টুলু মোটরের আলোতে ধরিল; একটু ভাবিল, তাহার পর লিখিল—

স্নেহের তটিনী,

চম্পার মুখে সব শুনেছিলাম। যা বলেছিল যদি সত্যি হয় তো আমার সন্তানকে তোমার হাতে দেওয়া রইল; আমার আদর্শ জান, সেইরকম ক'রে ওকে মানুষ ক'রো। এই সঙ্গে আমার উইলটা পাঠাচ্ছি, সম্পত্তি কম নেই, হীরাকে যত ইচ্ছা বড়ো করা চলবে,—মনে তো হয়, ওর মধ্যে বড় হবার অশেষ প্রেরণা জমাও রয়েছে।

চম্পা নেই। এরা জানে অসুখে মারা গেছে, আসলে কিন্তু আমার প্রতিবন্ধক হয়েছিল মনে ক'রে পথ ছেড়ে দাঁড়িয়েছে। তোমার সঙ্গে লুকুবার সম্বন্ধ নয় ব'লে তোমাকেই বললাম এ-কথাটা, হীরা পর্যন্ত কখনও জানবে না।

পরন্তু চম্পার শেষ কাজ, একটু নিষ্ঠার সঙ্গে করিয়ে দিও; এই আমার শেষ অনুরোধ।

ইতি

টুলু

গিরিধারীকে ডাকিয়া উইলের খাম আর চিঠিটা হাতে দিয়া বলিল—"তোমাদের বাইরের মা-মণির হাতে দিয়ে দেবে, আর পৌঁছে হীরাকে আগে না উঠিয়ে তাঁকেই আগে ডেকে নিয়ে আসবে।"

তাহার পর আর গাড়িটার দিকে ফিরিয়া না চাহিয়া, একেবারে লরির উপর উঠিয়া বলিল—"এবার চালাও সিংজী, একটু জোরে।"

কড়া আলোয় শুধু সামনের গতিপথটুকু উজ্জ্বল করিল, বাকি আর সবই গভীরতর অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করিয়া লরিটা ছুটিয়া চলিল।

শেষ